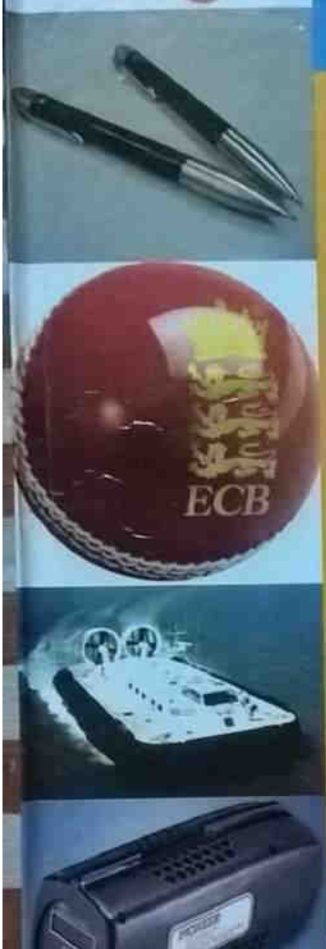


অনীশ দেব

কেমন করে কাজ করে যন্ত্র





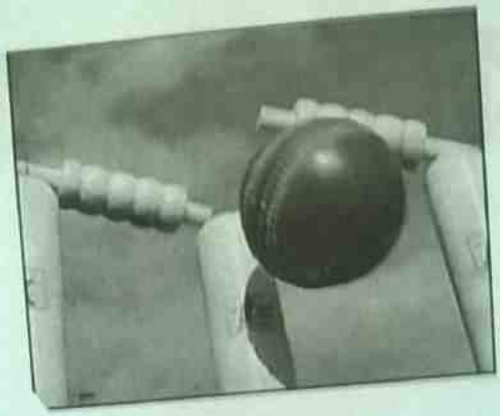


অনীশ দেব

কেমন করে কাজ করে যন্ত্র



পত্রভারতী



www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮ দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০১৪ চতুর্থ মুদ্রণ মে ২০১৪

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

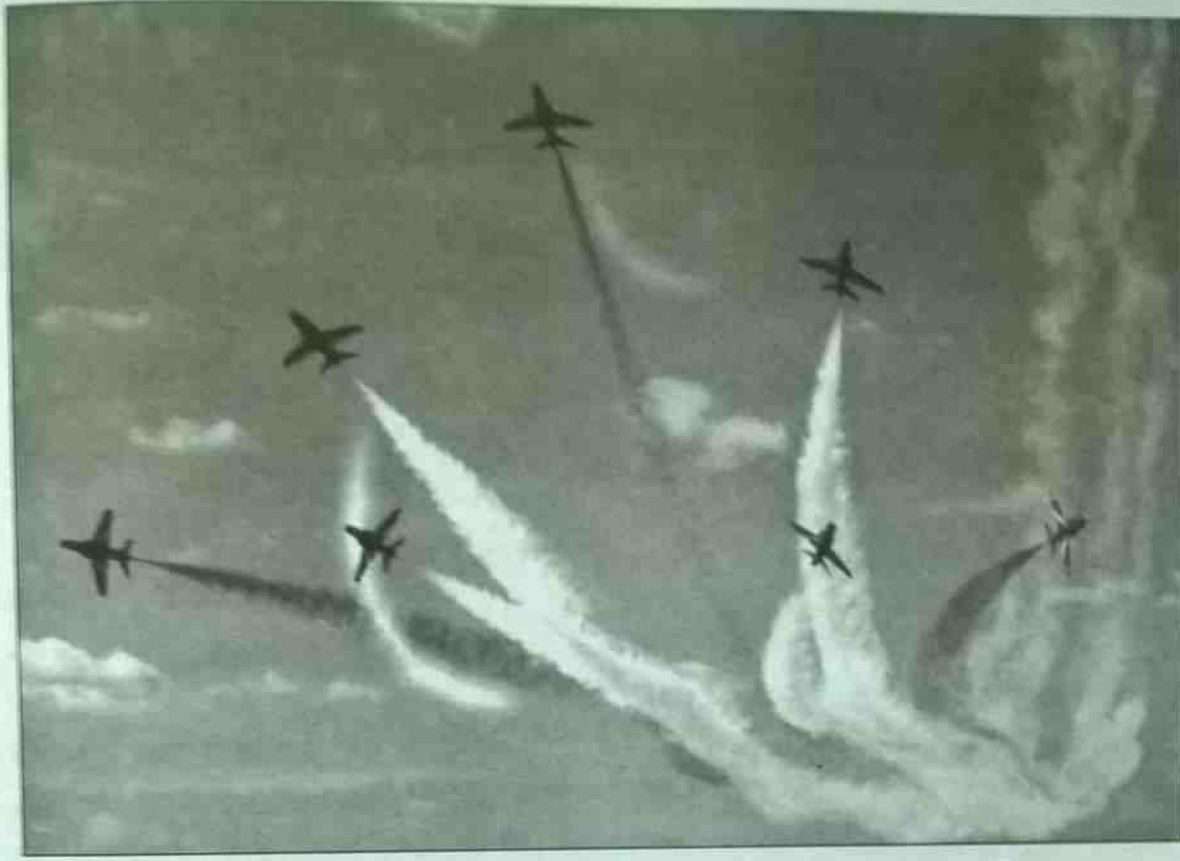
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সৌরীশ মিত্র

KEMON KORE KAJ KARE YANTRA
by Anish Deb
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 70.00

ISBN 978-81-8374-297-9

সূ চি প ত্র



এরোপ্লেন

এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে 'ভারী'। সুতরাং সেটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে গেলে নীচ থেকে ওপরে একটা বল প্রয়োগ করতে হয়। এরোপ্লেন যখন ওড়ে তখন মোট চাররকম বল তার ওপরে কাজ করে। বলগুলো হল : ওজন, উত্থানবল, ঘাত এবং পিছুটান। এই চাররকম বল মিলে তৈরি হয় এরোডায়ানামিক ফোর্স বা বায়ুগতীয় বল।

ওজন তো তোমরা সবাই জানো : পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য যে-বল কোনো বস্তুর ওপরে কাজ করে। এরোপ্লেনকে সেটা টেনে নামিয়ে নিতে চায় নীচে। আর উত্থানবল তৈরি হয় বেশ অদ্ভুত কায়দায়। এরোপ্লেনের দুটো বিশাল ডানার ওপরের দিকে বায়ুচাপ কম হয়, নীচের দিকে হয় বেশি। ফলে উত্থানবল এরোপ্লেনকে ওপরদিকে ঠেলে দিতে চায়। কিন্তু উত্থানবল তৈরি করতে গেলে এরোপ্লেনকে বাতাস কেটে ছোটাতে হবে। এই কাজটি করে ঘাত। এই ঘাত তৈরি করে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন। প্লেন ছোটার সময় বাতাসের





ইঞ্জিনচালিত প্রথম এরোপ্লেন ফ্লায়ার-ওয়ান। ১৯০৩ সালে নর্থ ক্যারোলাইনার কিটি হকে এই প্লেন উড়িয়েছিলেন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট।

সঙ্গে ঘষা লেগে একটা পিছুটান তৈরি হয়—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ড্র্যাগ বল। সুতরাং, প্লেনের ইঞ্জিন বেশ শক্তিশালী হওয়া দরকার—যাতে সে পিছুটান ছাপিয়ে সামনে এগোতে পারে।

এরোপ্লেনের ডানাকে খাড়াভাবে কাটলে যে-চেহারা চোখে পড়বে তাকে বলা হয় এরোফয়েল সেকশান। এই সেকশানের চেহারায় রদবদল ঘটিয়ে উত্থানবলের তুলনায় পিছুটানকে অনেক কম রাখা যায়। পরের পৃষ্ঠার ছবিতে এরোপ্লেনের ডানার অংশ দেখানো হল।

এরোপ্লেনের ডানা যখন বাতাস কেটে এগোয় তখন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ডানা যেদিকে এগোয় তার ঠিক বিপরীতদিকে ডানার তল ঘেঁষে বাতাস বইতে থাকে। ডানার সামনের কিনারা থেকে পিছনের কিনারায় বাতাস পৌঁছয় দুটো পথ দিয়ে : ডানার ওপর দিয়ে, আর ডানার নীচ দিয়ে। ডানার নীচের তল ঘেঁষে যে-বাতাস বয় সে উপরিতলের বাতাসের চেয়ে কম সময়ে পৌঁছে যায় পিছনের কিনারায়। এই দুরকম গতিবেগের জন্য পিছনের কিনারা বরাবর বাতাসের ঘূর্ণি তৈরি হয়। ঘূর্ণির আবর্তন উপরিতলের বাতাসের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, দু-দিকের বাতাসই একই সময়ে সামনের কিনারা থেকে পিছনের কিনারায় পৌঁছে যায়। যেহেতু উপরিতল বরাবর বাতাসের পথের দৈর্ঘ্য নীচের তলের চেয়ে বেশি, সেহেতু বলা যায়, উপরিতলের বাতাসের গতিবেগ নীচের

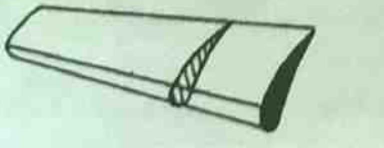
তলের চেয়ে বেশি। উপরিতলের বাড়তি গতিবেগ ডানার পিছনের কিনারা বরাবর আর ঘূর্ণি তৈরি হতে দেয় না। বরং ডানার উপরিতলের প্রতিটি বিন্দুতে বাতাসের চাপ নীচের তলের তুলনায় কমিয়ে দেয়। চাপের এই পার্থক্যই তৈরি করে অতি দরকারি উত্থানবল।

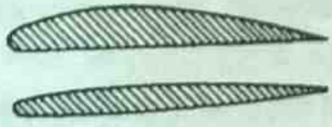
উত্থানবলের ব্যাপারটা তোমরা হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা কাগজের পৃষ্ঠা দু-হাতে মুখের সামনে ধরো। তারপর কাগজের উপরিতল বরাবর জোরে ফুঁ দাও। দেখবে কাগজটা ওপর দিকে ভেসে উঠছে। এর কারণ, ফুঁ দিলে কাগজের উপরিতলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়, আর চাপ কমে যায়। কিন্তু কাগজের নীচে বাতাস মন্থর বলে চাপও থাকে বেশি। ফলে নীচের অতিরিক্ত চাপ কাগজের পৃষ্ঠাকে ভাসিয়ে তুলতে চায় ওপরদিকে। এরোফয়েল সেকশান এই কাজটিই আরও নিখুঁতভাবে করে। সেইজন্যই তো অত বড় 'ভারী' এরোপ্লেনটা ভেসে থাকতে পারে আকাশে।

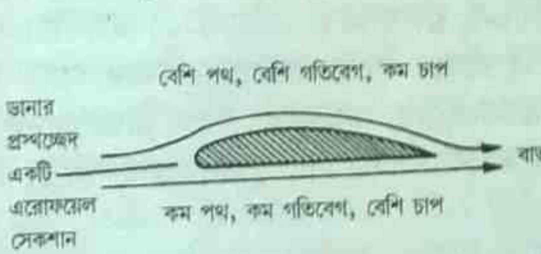
এরোফয়েল সেকশানের নীচের অনুভূমিক রেখাটিকে বলা হয় জ্যা-রেখা বা কর্ড লাইন। বাতাসের গতির অভিমুখের সঙ্গে জ্যা-রেখা কতটা কোণ তৈরি করেছে তার ওপরে বিভিন্ন বলের মান নির্ভর করে। ফলে চাররকম বল মিলে যে-বায়ুগতীয় বল তৈরি হয়, এই কোণের ওপর নির্ভর করে তার হেরফের ঘটে। এই কোণকে বলা হয় আপতন কোণ বা আক্রমণ কোণ। আপতন কোণ বাড়লে



এরোপ্লেনের ওপরে মোট চাররকম বল কাজ করে


এরোপ্লেনের ডানার প্রস্থচ্ছেদ একটি এরোফয়েল সেকশান


দুরকম এরোফয়েল সেকশান



এরোপ্লেনের ডানার তল ঘেঁষে বাতাসের গতি

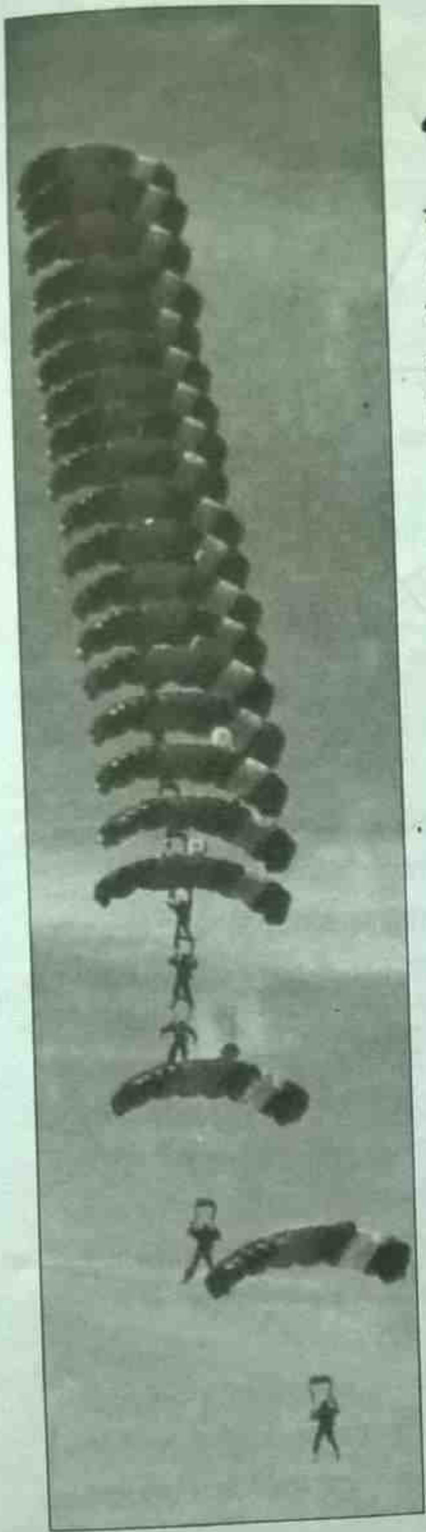


এরোপ্লেনের ডানার ওপরে ও নীচে চাপ বিন্যাস



উত্থানবলও বেড়ে যায়। সেইজন্যই প্লেন ওপরে তুলতে হলে পাইলট প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে দেয় ওপরদিকে, যাতে আপতন কোণ বেড়ে যায়। তারপর ওপরে ওঠার কাজ শেষ হলেই সে প্লেনটিকে অনুভূমিক করে দেয়। সুতরাং বুঝতেই পারছ, এরোপ্লেন নামাতে হলে তার মুখ ঘোরাতে হবে নীচের দিকে।

এ ছাড়া উড়ন্ত এরোপ্লেনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্লেনের ডানায় আর লেজে কতকগুলো ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়। এই পাতগুলো ইচ্ছেমতো ঘোরানো যায়। এগুলোর নাম হল এইলিরন, ফ্ল্যাপ এবং এলিভেটর। এইলিরন ও ফ্ল্যাপ থাকে ডানায়। প্রথমটি ব্যবহার করা হয় এরোপ্লেন শূন্যে ঘোরানোর সময়, আর ফ্ল্যাপ কাজে লাগে প্লেন ওঠা-নামার সময়। এলিভেটরগুলো সাধারণত থাকে এরোপ্লেনের লেজে। প্লেনের মুখ ওপর-নীচে ঘোরাতে এলিভেটরের ধাতব পাতগুলো সাহায্য করে।



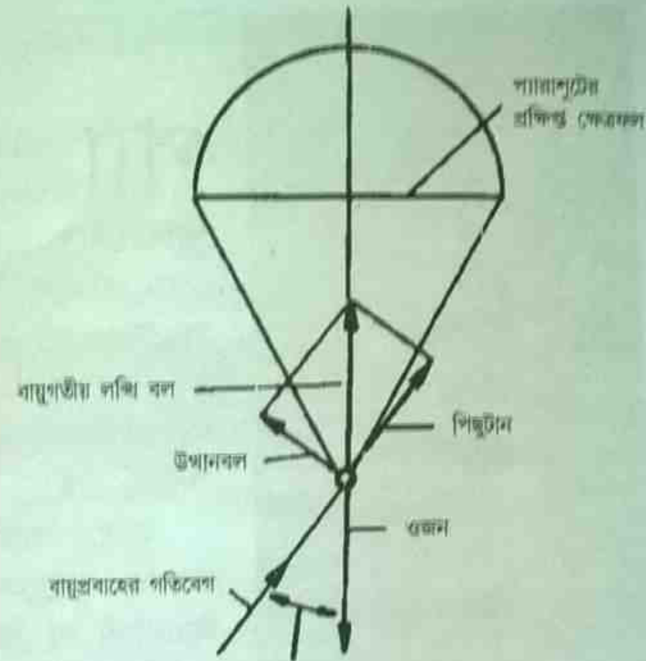
প্যারাশুট

প্যারাশুট তোমরা ছবিতে বা সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ। বিশাল ছাতার মতো একটা জিনিস, হাওয়ার চাপে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে, তার চারদিকে বাঁধা অনেকগুলো দড়ি নেমে এসেছে নীচে। সেখানে দড়িতে বাঁধা ঝুলন্ত একটি মানুষ হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে নীচে নামছে। যুদ্ধের সময়ে ছত্রী সৈন্যরা চলন্ত এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুটের সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ছাড়া বিদেশে প্যারাশুট-ঝাঁপ একটা খেলাও বটে।

ভাবতে পারো, প্যারাশুটের প্রথম পরিকল্পনা প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো। 1514 সালে ইটালির প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর নোটবইতে প্যারাশুটের একটি স্কেচ আঁকেন। এরপর আর-একজন ইটালিয়ান ফাউস্টো ভেরান্‌জিও 1595 সালে কাজ চালানোর মতো একটি প্যারাশুটের ছবি প্রকাশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যিকারের প্যারাশুট তৈরি করতে সময় লেগেছে আরও একশো নব্বই বছর। ফরাসি আকাশচারী জাঁ পিয়ের ফ্রাঁসোয়া ব্ল্যান্‌শার 1785 সালে লন্ডনে একটি কুকুরকে (কেউ-কেউ বলেন বেড়াল) প্রথম প্যারাশুট-যাত্রী হিসেবে ব্যবহার করেন। একটি বেতের ঝুড়িতে কুকুরটিকে বসিয়ে ঝুড়িটি প্যারাশুটের দড়ির সঙ্গো বেঁধে তিনি ওপর থেকে ছেড়ে দেন। কুকুরটি হাওয়ায় ভেসে নির্বিঘ্নে নেমে আসে মাটিতে। এরপর ফ্রান্সের লুই সেবাস্টিয়ান লেনরমাঁদ ফ্রান্সের মঁপেলিয়ার অবজারভেটরির টাওয়ার থেকে প্যারাশুট-ঝাঁপ দেন। 1797 সালে ফ্রান্সেরই আঁদ্রে জ্যাক্‌স গার্নারিন প্রায় দু-হাজার ফুট উঁচুতে ভেসে বেড়ানো একটি বেলুন থেকে প্যারাশুট-ঝাঁপ দিয়েছেন। সেই সময়ে মানুষ প্যারাশুট-ঝাঁপ দিত নিতান্তই আবিষ্কারের আনন্দে, রোমাঞ্চের তাগিদে। প্যারাশুট তেমনভাবে কোনো কাজে লাগত না। কিন্তু এরোপ্লেন আবিষ্কার হওয়ার পর প্যারাশুটের ব্যবহার খুব বেড়ে গেল। একইসঙ্গো বাড়ল তার কদর।



1797 সালের অক্টোবর মাস। একটি বেলুন থেকে প্যারাশুটে করে ঝাঁপ দিলেন আঁদ্রে জ্যাক্স গার্নারিন। 2230 ফুট নামার সময় গার্নারিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।



প্যারাশুটের ওপরে যেসব বল ক্রিয়া করে

এরোপ্লেন থেকে প্রথম সফল প্যারাশুট-ঝাঁপ দিয়েছিলেন মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন অ্যালবার্ট বেরি। সময়টা ছিল 1912 সাল।

এবারে প্যারাশুটের কাজ করার কায়দাকানুন ও কলকবজার খবরাখবর নেওয়া যাক।

প্যারাশুট যখন খুলে গিয়ে ধীরে-ধীরে পড়তে থাকে তখন তার ওপর যেসব বল কাজ করে সেগুলো একরকম ব্যালান্স বা সাম্য তৈরি করে। বলগুলি হল প্যারাশুটসমেত যাত্রীর ওজন, হাওয়ার ধাক্কায় ড্র্যাগ বা পিছুটান এবং উত্থানবল।

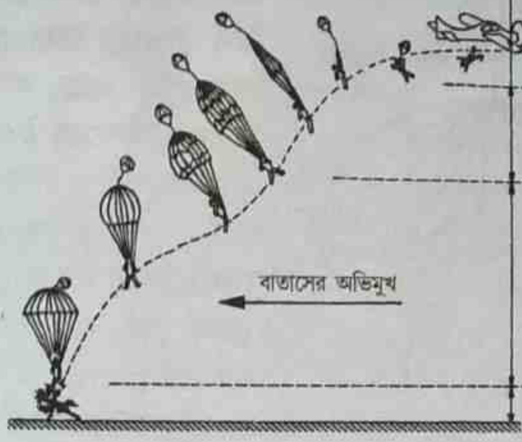
পিছুটান নির্ভর করে তিনটি জিনিসের ওপরে :

1. প্যারাশুটের পতনের গতিবেগের বর্গ।
2. প্যারাশুটের প্রোজেক্টেড এরিয়া বা প্রক্ষিপ্ত ক্ষেত্রফল (প্যারাশুট উল্লম্বভাবে নামলে অনুভূমিক তল বরাবর তার প্রক্ষিপ্ত ক্ষেত্রফল বৃত্তাকার হয়। অর্থাৎ, তখন প্যারাশুটকে সরাসরি ওপর বা নীচ থেকে দেখলে যেমন দেখাবে।)।
3. বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব।

বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ও ওজনের নিম্নমুখী বলের মধ্যে যে-কোণ তৈরি হয় তাকে বলা

হয় 'অ্যাপ্রোচ ভেলোসিটি' বা অভিগমন গতিবেগের কোণ। এই কোণ যদি শূন্য ডিগ্রি হয় তাহলে পিছুটান ওজনের সঙ্গো সমান হয়ে যায়। তবে প্যারাশুটের পতনের হার একই থাকে।

একটা প্যারাশুটের বিভিন্ন অংশের নাম বিভিন্ন। পরের পৃষ্ঠার ছবিতে তার নানান অংশের পরিচয় দেওয়া হল।



রিপকর্ড পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত প্যারাশুট কীভাবে নামে

ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় প্যারাশুট দুভাবে খুলতে পারে। একটিকে বলা হয় 'স্ট্যাটিক লাইন' পদ্ধতি, আর দ্বিতীয়টির নাম 'রিপকর্ড' পদ্ধতি।

স্ট্যাটিক লাইন আসলে সতেরো ফুট (প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার) লম্বা একটি দড়ি। দড়ির একটা প্রান্ত বাঁধা থাকে প্যারাশুটের চাঁদোয়ার ঠিক মাঝখানে যে-ফুটো থাকে তার সঙ্গো। আর অন্য প্রান্তটি লাগানো থাকে এরোপ্লেনের ভেতরে। প্যারাশুটযাত্রী প্লেন থেকে লাফ দেওয়ার সামান্য পরেই স্ট্যাটিক লাইনে টান পড়ে। তখন সেই টানে যাত্রীর পিঠে বাঁধা প্যাকেট থেকে প্যারাশুটটি বেরিয়ে আসে। দড়িতে টান পড়ে স্ট্যাটিক লাইন ছিঁড়ে যায়। তবে তার অন্য প্রান্তটি প্লেনের সঙ্গোই বাঁধা থাকে। প্যারাশুটযাত্রী অবাধে নীচে পড়তে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্লেন থেকে ঝাঁপ দেওয়া আর প্যারাশুট খোলার মধ্যে সময়ের তফাত থাকে মাত্র এক সেকেন্ড।

রিপকর্ড পদ্ধতিতে প্যারাশুট খোলার ব্যাপারটা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয় প্যারাশুটযাত্রীর ওপরে। রিপকর্ডের হাতল ধরে টান মারলেই 'রিপ পিন' নামে একটি পিন খুলে যায়। তখন ছাতার মতো ছোট একটি প্যারাশুট বেরিয়ে আসে। তাকে বলা হয় 'পাইলট প্যারাশুট'। পাইলট প্যারাশুট ফেঁপে-ফুলে টেনে বের করে আসল বড় প্যারাশুটকে। অনেক সময় 'অটোমেটিক টাইমার' দিয়েও রিপ পিন খোলা হয়।

যখন অনেক মানুষ একসঙ্গো প্যারাশুট-ঝাঁপ দেয় তখন স্ট্যাটিক লাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আর বিপদের সময় প্রাণ বাঁচাতে পাইলট যখন ঝাঁপ দেয় তখন ব্যবহার করা হয় রিপকর্ড পদ্ধতি।

প্যারাশুটে করে যারা নামে তাদের বলা হয় 'প্যারাট্রুপার'। মার্কিন প্যারাট্রুপাররা সাধারণত দুটো প্যারাশুট ব্যবহার করে। তাদের আসল প্যারাশুটটা থাকে পিঠের প্যাকেটে আর একটি মজুত প্যারাশুট থাকে বুকের কাছে। মূল প্যারাশুটের ব্যাস প্রায় সাড়ে দশ মিটার,

আর মজুত প্যারাশুটের ব্যাস সাত মিটার। পাইলটদের ঝাঁপ দেওয়ার জন্য যে-প্যারাশুট ব্যবহার করা হয় তার ব্যাস প্রায় সাড়ে আট মিটার। সব ধরনের প্যারাশুটই মজবুত নাইলনের তৈরি।



মূল প্যারাশুট ও পাইলট প্যারাশুট

প্যারাশুট-অবতরণকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। আগের পৃষ্ঠার ছবিতে সেগুলো দেখানো হল। 'ফ্রি ফল' বা বাধাহীন পতন অংশে প্যারাশুটযাত্রীর গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। তবে বাতাসের পিছুটান ও ঘর্ষণের ওপর নির্ভর করে এই গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে স্থির হয়। এই মানকে বলা হয় 'টার্মিনাল ভেলোসিটি' বা সীমান্ত বেগ। তখন রিপকর্ডের হাতল টেনে রিপ পিন খোলা হয় এবং পাইলট প্যারাশুট বেরিয়ে আসে। তার টানে খুলে যায় মূল প্যারাশুট। এই প্যারাশুট খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই পতনের বেগ ঘণ্টায় প্রায় একশো আশি কিলোমিটার থেকে নেমে আসে পনেরো-কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে। এইভাবে হঠাৎ করে গতিবেগ কমে যাওয়ায় প্যারাশুটযাত্রী অনুভব করে 'ওপেনিং শক' বা উন্মোচন-অভিঘাত। এর পরে গতিবেগের আর কোনো হেরফের হয় না।

প্যারাশুটের পতনের বেগ নির্ভর করে অনেকগুলো জিনিসের ওপরে : প্যারাশুটের ব্যাস, আকার, প্যারাশুটযাত্রীর ওজন, বাতাসের প্যারাশুট-কাপড় ভেদ করার ক্ষমতা ও বাতাসের ঘনত্ব। মোটের ওপর, প্যারাশুটের পতনের হার সাধারণত এমন থাকে যাতে মাটিতে পৌঁছনোর অভিঘাত মোটামুটিভাবে দেড় মিটার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো হয়।

আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়া ছাড়াও প্যারাশুট অন্যান্য কাজে লাগে। যেমন কোনো-কোনো অতি দ্রুতগামী প্লেন নামার সময়ে গতি কমানোর জন্য কখনও-কখনও পিছুটান প্যারাশুট ব্যবহার করে। সহজে ব্রেক কষার সুবিধের জন্য পরীক্ষামূলক রেসিং গাড়িও প্যারাশুট ব্যবহার করে। এ ছাড়া 'স্কাই ডাইভিং' বা আকাশ-ঝাঁপ খেলায় খেলোয়াড়রা অনেক উঁচুতে ওড়া এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়। এ ছাড়াও চালু হয়েছে এক ধরনের পরীক্ষামূলক প্যারাশুট যার নাম 'প্যারাফয়েল'। অনেকটা এরোপ্লেনের ডানার চেহারায় তৈরি এই প্যারাশুটগুলো খাড়াভাবে নীচে না নেমে তেরছাভাবে ভেসে নীচে নেমে আসে।



বায়ু-আসনযান

বায়ু-আসনযান বা 'হোভারক্র্যাফ্‌ট'-কে উভচর যান বলা যেতে পারে। কারণ, এই যানটি জলে অথবা ডাঙায় সমানভাবে ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে হোভারক্র্যাফ্‌ট তেমন পরিচিত না হলেও বিদেশে এর চল শুরু হয়েছে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই। মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে বাতাসের আসনের ওপর ভর করে হোভারক্র্যাফ্‌ট চলাফেরা করে। ফলে মাটির সঙ্গো যন্ত্রের কোনো অংশের সরাসরি কোনো যোগ থাকে না। জলের ওপরেও একইভাবে বায়ু-আসনে ভর করে ছুটে চলে হোভারক্র্যাফ্‌ট।

ইতিহাস ঘেঁটে যেটুকু জানা যায় তাতে প্রথম যিনি বায়ু-আসনযান নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা শুরু করেন তিনি একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার—নাম স্যার জন থর্নিক্রফ্‌ট। 1870-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর কয়েকটা পরীক্ষামূলক মডেলও তৈরি করেন। তাঁর ধারণা ছিল, জাহাজের খোলের তলার দিকটা যদি অবতল আকারের হয় (অর্থাৎ, অনেকটা ওলটানো কড়াইয়ের মতো) এবং সেই ফাঁকা জায়গায় যদি বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জাহাজের পিছুটান অনেক কমে যাবে। কারণ, বন্দি বাতাসের জন্য সমুদ্রের জল ও জাহাজের তলদেশের সরাসরি সংস্পর্শ থাকবে না। ফলে জাহাজ অনেক মসৃণ এবং জোরালো গতিতে এগোতে পারবে। তবে বন্দি বাতাসের তৈরি ওই বায়ু-আসনটিকে জাহাজের সঙ্গো-সঙ্গোই এগিয়ে যেতে হবে। চলার সময় বায়ু-আসনের বাতাসের যেটুকু বাইরে বেরিয়ে যাবে সেটুকু কোনো বায়ু পাম্প দিয়ে জোগান দিতে পারলেই আর কোনো অসুবিধে হবে না। 1877 সালে নেওয়া এক পেটেন্টে থর্নিক্রফ্‌ট এসব তত্ত্বের উল্লেখ

করেছিলেন। কিন্তু বায়ু-আসনের বাতাস সংরক্ষণের কাজে তিনি সফল হননি।

সফলতা এল প্রায় আশি বছর পরে।

প্রথম সফল বায়ু-আসনযান তৈরি করে হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর সঙ্গো নিজের নাম চিরকালের জন্য সংযুক্ত করলেন ক্রিস্টোফার কক্‌রেল। ভদ্রলোক ব্রিটিশ নাগরিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেডার বা বেতারযন্ত্রের গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর নৌকো তৈরি শুরু করেন। এই সময়ে তিনি থর্নিক্রফ্‌টের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন।

সফল হওয়ার পর কক্‌রেল প্রথম পেটেন্ট নেন 1955 সালের 12 ডিসেম্বর। আর তার পরের বছরেই 'হোভারক্র্যাফ্‌ট লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি গঠন করেন। তাঁর তৈরি হোভারক্র্যাফ্‌ট প্রথম চলাচল করে 1959 সালে। পূর্ণ মাপের চার টন ওজনের এই যানটির নাম ছিল 'এস. আর. এন-ওয়ান'। সেই বছরেই 25 জুলাই কক্‌রেলের হোভারক্র্যাফ্‌ট ইংলিশ চ্যানেল পার হয়। তাঁর অবদানের জন্য 1969 সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেয়।

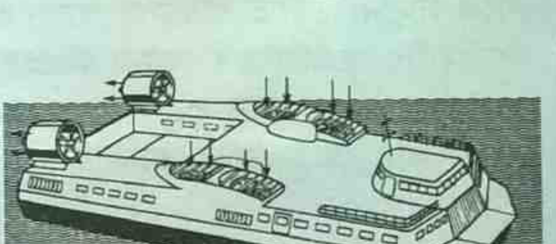
হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর বায়ু-আসন তৈরির জন্য একটি পাখা থাকে। এই পাখা বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলে হোভারক্র্যাফ্‌ট যানকে বাতাসের আসনের ওপরে ভাসিয়ে রাখে। যে-নীতি অনুযায়ী বায়ু-আসন তৈরি হয় তাকে বলে 'গ্রাউন্ড এফেক্ট' বা 'ভূমিক্রিয়া'। হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর পাখাটি মাটির খুব কাছাকাছি থাকে। ফলে পাখা যে-বায়ুপ্রবাহ তৈরি করে তার চেহারা হয় অনেকটা বলয়াকৃতি—অর্থাৎ, সমস্ত প্রবাহ ও বিক্ষোভ বৃত্তাকার প্রান্ত বরাবর একজোট হয়, আর মাঝখানে তৈরি হয় বায়ু-আসন। বায়ু-আসনের বাতাস প্রায় স্থির থাকে বলা যায়। এই আসনকে ঘিরে তৈরি হয় বলায়াকার বায়ু-জেট। এই জেট একটি বায়ুর পরদা তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলের কম চাপের

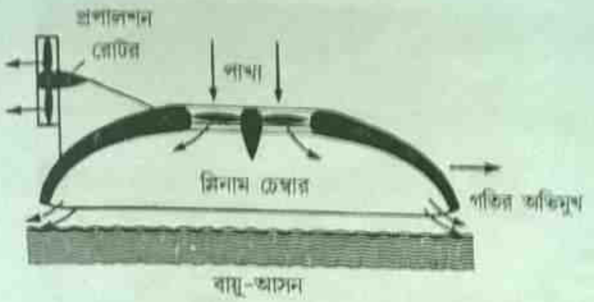


জাহাজের অবতল খোলের নীচে বাতাস বন্দি রেখে জাহাজের খোলের সঙ্গো জলের ঘর্ষণ বল কমানোর পদ্ধতি



হোভারক্র্যাফ্‌টের ওপরে ভূমিক্রিয়া


আগামীদিনের যাত্রীবাহী হোভারক্র্যাফ্‌টের চেহারা



প্লিনাম চেম্বার নীতিতে তৈরি হোভারক্র্যাফ্‌ট



অ্যানিউলার চেম্বার নীতিতে তৈরি হোভারক্র্যাফ্‌ট

বাতাসকে এই পরদাটি বায়ু-আসনের বেশি চাপের বাতাস থেকে আড়াল করে রাখে। বেশি চাপের বায়ু-আসনটির ওপরেই ভেসে থাকে হোভারক্র্যাফ্‌ট।

একই নীতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের হোভারক্র্যাফ্‌ট তৈরি হয়েছে। তারই একটি ছবিতে দেখানো হল। বিশাল যে-কক্ষটির মধ্যে বায়ু-আসন তৈরি হয় তার নাম প্লিন্যাম চেম্বার। একটি পাখা প্লিন্যাম চেম্বারে বাতাস ভরতি করে, আর দ্বিতীয় পাখাটি হল প্রপাল্‌শন রোটর—যা হোভারক্র্যাফ্‌টকে অনুভূমিক গতি দেয়। প্রয়োজনীয় উত্থানবল পাওয়ার জন্য প্লিন্যাম চেম্বারের ভূমির ক্ষেত্রফল বেশ বড়ো হওয়া দরকার।

আর-এক ধরনের হোভারক্র্যাফ্‌ট আছে যা প্লিন্যাম চেম্বারের বদলে অ্যানিউলার চেম্বার বা বলয়াকার কক্ষ ব্যবহার করে। এর ফলে যানের কর্মক্ষমতা কিছুটা বেড়ে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সুস্থিতির জন্য প্রায় ছ'মিটার ব্যাসের কোনো বায়ু-আসনযান মাটি থেকে প্রায় 0.6 মিটার উঁচুতে ভেসে চলাফেরা করলে ভালো হয়। চলার সময় বাতাসের বাধা কমানোর জন্য হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর বায়ু-আসনের অনুভূমিক তলের আকৃতি বৃত্তাকার না করে ডিম্বাকৃতি বা আয়তাকার করা হয়। হোভারক্র্যাফ্‌ট-এর ওপরে যেসব বল ক্রিয়া করে সেগুলো বিশদভাবে ছবিতে দেখানো হল।

বিদেশে হোভারক্র্যাফ্‌ট নিয়ে এখনও নানান গবেষণা চলছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হোভারক্র্যাফ্‌ট ব্যবহার করা হচ্ছে সামরিক কাজে, কারণ, জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করার মতো সস্তায় হোভারক্র্যাফ্‌ট এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি।



লিফ্ট বা এলিভেটর

লিফ্ট মানে উঁচুতলার বাড়িতে যে-খাঁচাটি মানুষজন বয়ে নিয়ে ওঠা-নামা করে। তোমরা সকলেই বোধহয় জিনিসটা দেখেছ, লিফটে চড়েছও অনেকেই। এর 'এলিভেটর' নামটা চালু হয় আমেরিকা থেকে।

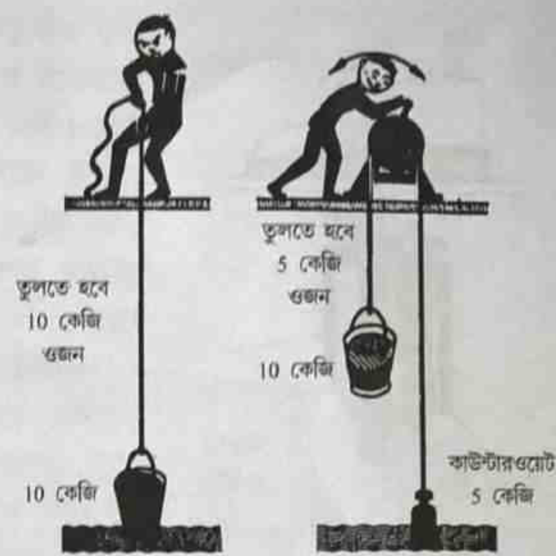
প্রথম নিরাপদ এলিভেটর আবিষ্কার করেন আমেরিকার ইলাইশা গ্রেভস ওটিস, 1852 সালে। 1854 সালে নিউইয়র্ক শহরে ওটিস তাঁর তৈরি এলিভেটর চালিয়ে সবাইকে দেখিয়েছিলেন। ওটিস নিজে এলিভেটরে চড়ে উঠে যান অনেক উঁচুতে। তারপর সহকারীদের এলিভেটরের ধাতব দড়ি কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। দড়ি কেটে দেওয়ার পর এলিভেটরটি খুব ধীরে-ধীরে নিরাপদে নেমে আসে নীচে। তাতে প্রমাণিত হয়, এলিভেটর মোটেই বিপজ্জনক নয়। তখন থেকেই এই নতুন যন্ত্রটির চল শুরু হয়।

এলিভেটর চালু হওয়ার আগে মানুষ পাঁচ-ছ'তলার চেয়ে উঁচু বাড়ি তৈরি করত না। অবশ্য খনি ও কারখানায় কয়লা বা অন্যান্য মালপত্র কপিকল দিয়ে টেনে তোলার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে তৈরি এলিভেটরগুলো চলত বাষ্পীয় ইঞ্জিনে। তারপর এল জলচালিত এলিভেটর। অবশেষে, 1890 সালে, যখন বিদ্যুৎশক্তি আমেরিকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে

গেল, তখন চালু হল বৈদ্যুতিক এলিভেটর। আমেরিকায় এখন শতকরা একশো ভাগ এলিভেটরই বৈদ্যুতিক।

এখন প্রশ্ন হল, কেমন করে কাজ করে বৈদ্যুতিক এলিভেটর বা লিফ্‌ট?

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, লিফ্‌ট ওপরে উঠে গেলে কালো রঙের একটা ওজনদার জিনিস নেমে আসে নীচে। তার সঙ্গে লাগানো থাকে একটা শক্তপোক্ত ধাতব দড়ি। আর যেখানে ওজনটা নেমে আসে সেখানে থাকে একটা মজবুত স্প্রিং, যাতে ওজনটা মেঝের সঙ্গে জোরালো ধাক্কা না খায়। এই ওজনটাকে পরিভাষায় বলা হয় 'কাউন্টারওয়েট'। কাউন্টারওয়েটের রহস্য ব্যাখ্যা করতে একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক।



কাউন্টারওয়েট ব্যবহারের সুবিধে

মনে করো, একজন লোক কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলছে। জলসমেত বালতির ওজন (প্রকৃতপক্ষে, ভর) ধরা যাক দশ কিলোগ্রাম। এই দশ কিলোগ্রাম ওজন তুলতে লোকটিকে কিছু শক্তি খরচ করতে হবে। এখন সে মনে-মনে একটা মতলব ভাঁজল। দড়িটার একপ্রান্তে বালতি বাঁধা রয়েছে। সে করল কী অন্য প্রান্তে পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের একটা লোহার খণ্ড বেঁধে দিল। তারপর দড়িটা ঝুলিয়ে দিল একটা কপিকলের ওপর দিয়ে। এবার যদি সে কপিকলের হাতল ঘুরিয়ে জল ভরতি বালতিটা টেনে ওপরে তোলে তা হলে আগের চেয়ে অনেক কম শক্তি তাকে খরচ করতে হবে। সুতরাং ওই পাঁচ কিলোগ্রাম লোহাটুকুই হল জলভরতি বালতির 'কাউন্টারওয়েট'। কাউন্টারওয়েটের জন্যই লোকটিকে এবার জল তোলার জন্য কম পরিশ্রম করতে হবে। তার মনে হবে, সে মাত্র পাঁচ কিলোগ্রাম ওজন তুলছে—অর্থাৎ, জলভরতি বালতির ওজন ও কাউন্টারওয়েটের বিয়োগফল। যদি কাউন্টারওয়েটের ওজন হয় আট কিলোগ্রাম, তাহলে লোকটিকে টেনে তুলতে হবে মাত্র দু-কেজি ওজন।

লিফ্‌টের বেলায় জলভরতি বালতিটা হচ্ছে মানুষসমেত খাঁচা, আর কপিকলটি ঘোরানো হয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে। মোটর কপিকল ঘুরিয়ে যে-ওজনটুকু টেনে তোলে সেটা মানুষভরতি খাঁচা আর কাউন্টারওয়েটের ওজনের বিয়োগফল। লিফটে লোক কম বা বেশি উঠলে এই বিয়োগফলের সামান্য হেরফের হয়।

চলন্ত লিফ্‌টকে তড়িৎচুম্বকের সাহায্যে ব্রেক কষে থামানোর ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, কোনো তলায় এসে থামার আগে লিফ্‌ট-এর গতি বেশ কমে যায়। এটা

করা হয় মোটরের গতি কমিয়ে। অটোমেটিক সুইচ দিয়ে মোটরকে দ্রুতগতি থেকে কম গতিতে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার লিফ্ট-এর দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা-বন্ধ করার জন্যও থাকে একই ধরনের অটোমেটিক সুইচ। লিফ্ট যখন বাড়ির কোনো তলায় এসে থামে তখন এই স্বয়ংক্রিয় সুইচের কাণ্ডকারখানাতেই দরজা খুলে যায়, আবার বন্ধ হয়।



লিফট চলাচল ব্যবস্থা

লিফ্ট ওপরে-নীচে ওঠা-নামার সময়ে যাতে পাশে নড়াচড়া করতে না পারে তার জন্য খাঁচার দুপাশে দুটো খাড়া লোহার রেল থাকে—ঠিক রেল লাইনের মতো। এই রেল লাইন দুটো লিফ্ট-এর খাঁচার গায়ে খাঁজে বসে থাকে। ফলে রেল লাইন বরাবর ওঠা-নামা করা ছাড়া খাঁচাটির পথ থাকে না। এই রেল লাইন দুটিকে বলা হয় 'গাইড রেল'। কাউন্টারওয়েটের জন্যও একইরকম গাইড রেল থাকে।

এবারে আসা যাক দুর্ঘটনার কথায়। হঠাৎ করে যদি লোডশেডিং হয় বা লিফ্ট টেনে তোলার ইস্পাতের দড়িটা পট্ করে ছিঁড়ে যায়, তাহলে! না, লিফ্ট-এর যাত্রীদের এতে কোনো বিপদ হবে না। কারণ, এ ধরনের বিপদ এড়ানোর জন্য আধুনিক লিফ্টে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। ঠিক যেমনটি ছিল ওটিসসাহেবের এলিভেটরে। কোনো দুর্ঘটনার ফলে খাঁচা গড়গড় করে নামতে শুরু করলেই একটা নিরাপত্তা সুইচ 'অন' হয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে ইস্পাতের দুটি শক্তিশালী দাঁত গাইড রেল দুটোকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। ফলে রেল বেয়ে খাঁচাটি আর নীচে নামতে পারে না। আধুনিক লিফ্টে আরও সব নতুন ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। যেমন, দরজা ঠিকমতো বন্ধ না হলে লিফ্ট চালু হবে না। কোনো তলায় ঠিকমতো এসে না দাঁড়ালে লিফ্টের দরজা খোলা যাবে না। এরকম আরও কত! লোডশেডিং হলে বা মোটর বিকল হলে কপিকলকে হাতে করে ঘোরানোর ব্যবস্থাও থাকে। তাতে লিফ্টকে খুশিমতো যে-কোনো তলায় এনে দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে বের করে নেওয়া যায়। তা ছাড়া লিফ্ট-এ বিপদসংকেতের অ্যালার্ম তো থাকেই!



সুপারসনিক জেট

আমরা জানি যে, 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় বায়ুতে শব্দের গতিবেগ মোটামুটিভাবে সেকেন্ডে প্রায় 331 মিটার—অর্থাৎ, ঘণ্টায় প্রায় 1193 কিলোমিটার বা 746 মাইল। এই গতিবেগের চেয়ে বেশি কোনো গতিবেগকে বলা হয় 'সুপারসনিক স্পিড' বা 'অধিশ্রব বেগ'। আজকাল আমরা সুপারসনিক জেট, সুপারসনিক এরোপ্লেন, এই কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছি। এর অর্থ হল, এই প্লেনগুলো আকাশপথে উড়ে চলে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে। এত দ্রুতগতিতে চলতে গেলে বায়ু একটু বিচিত্র আচরণ করে। কেন করে সেটাই একটু খতিয়ে দেখা যাক।

কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তেমন গতিবেগ নিয়ে কোনো জিনিসই 'চলতে' পারে না। কারণ, কঠিন পদার্থের দৃঢ়সংবদ্ধ অণু-পরমাণু চলমান বস্তুটিকে বাধা দেয়। সাধারণত যানবাহন বলতে আমরা যা বুঝি তা চলাফেরা করে তরল অথবা গ্যাসীয় মাধ্যমে। যেমন ডুবোজাহাজ চলে জলের মধ্যে দিয়ে, আর উড়োজাহাজ চলে বায়ুর মধ্যে দিয়ে। সমুদ্রের জলে শব্দের গতি সেকেন্ডে প্রায় 1463 মিটার—অর্থাৎ, ঘণ্টায় প্রায় 5267 কিলোমিটার বা 3292 মাইল। অতএব জলে অধিশ্রব বেগ সম্পন্ন কোনো যান চালাতে হলে তার গতিবেগ

হতে হবে ঘণ্টায় 5267 কিলোমিটারের বেশি—যা কল্পনা করাই অসম্ভব! অতএব মানুষের তৈরি অধিশ্রব বেগসম্পন্ন যান বলতে জেট, এরোপ্লেন, মিসাইল ইত্যাদি—যা বায়ু-মাধ্যমে চলাফেরা করে। যেসব বায়ুযান শব্দের চেয়ে কম গতিতে চলে তাদের কাছে বায়ু একটি 'নরম' মাধ্যম। কারণ, তাদের চলার ফলে বায়ুস্তরে যে-কম্পন অথবা শব্দ তৈরি হয় তা যানগুলির চেয়ে দ্রুতগামী। ফলে কম্পনরত বায়ুস্তর ভেদ করে যানগুলিকে এগোতে হয় না। কিন্তু অধিশ্রব বেগসম্পন্ন যানগুলির ক্ষেত্রে ঘটনা হয় এর উলটো : কম্পনরত বায়ুস্তর ভেদ করেই যানগুলিকে এগোতে হয়। ফলে বায়ু আর 'নরম' মাধ্যম থাকে না, আপাতভাবে হয়ে যায় 'শক্ত' মাধ্যম। তখন বায়ুযানকে প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি হতে হয়। তাকে অতিক্রম করতে হয় সনিক ব্যারিয়ার বা 'শব্দ-প্রাচীর'। শব্দ-তরঙ্গ যে-গতিতে এগোয় অধিশ্রব বায়ুযান তার চেয়ে দ্রুতগতিতে বায়ুস্তরে অতি-চাপের কম্পন সৃষ্টি করে। ফলে বায়ুযানের ঠিক পিছনে শঙ্কু আকৃতির একটি অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয় অতি-চাপের 'বো ওয়েভ' বা 'শক ওয়েভ' বা 'অভিঘাত তরঙ্গ'।

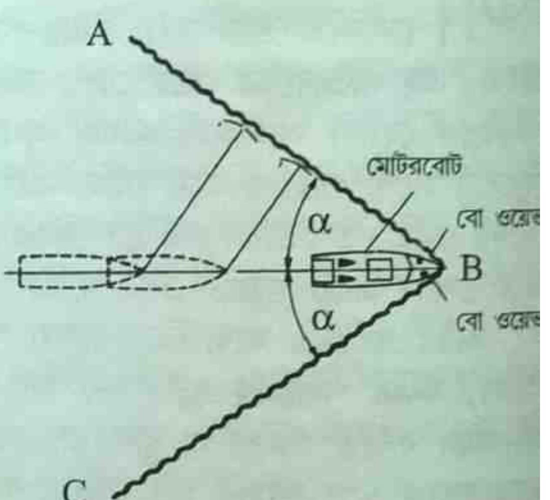
জলের ওপর দিয়ে যখন কোনো মোটরবোট ছুটে চলে তখন মোটরবোটের সামনের অংশের ধাক্কায় তৈরি হয় ঢেউ। এই ঢেউ মোটরবোটের দু-দিকে ত্রিভুজের দুটি বাহুর মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার গতির চেয়ে মোটরবোটের গতি যদি বেশি হয় তাহলে অধিশ্রব বায়ুযানের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন মোটরবোটের গতিরেখার দুপাশে মোট 2α (আলফা) কোণ জুড়ে তৈরি হয় অভিঘাত



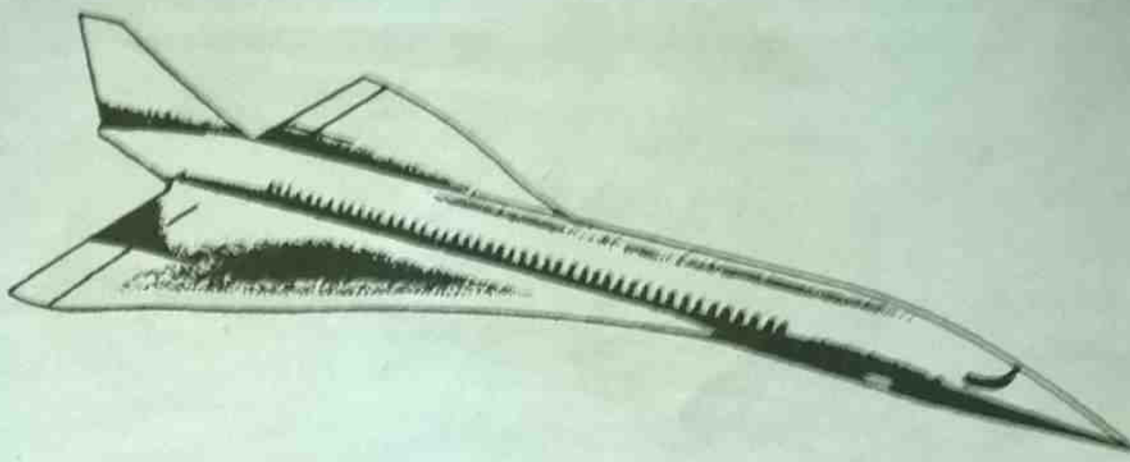
ছুরি দিয়ে যখন কাগজ কাটা হয় তখন 'হিস' শব্দ শোনা যায়



বুলেট যখন বাতাস কেটে ছুটে যায় তখন তৈরি হয় 'বো ওয়েভ' আর 'টেইল ওয়েভ'



জলের ওপরে ছুটে যাওয়া মোটরবোট অভিঘাত তরঙ্গ তৈরি করে



সুপারসনিক যাত্রীবাহী প্লেন কঁকর্ড বাতাসের চেয়ে 2.2 গুণ গতিবেগে ছুটতে পারে

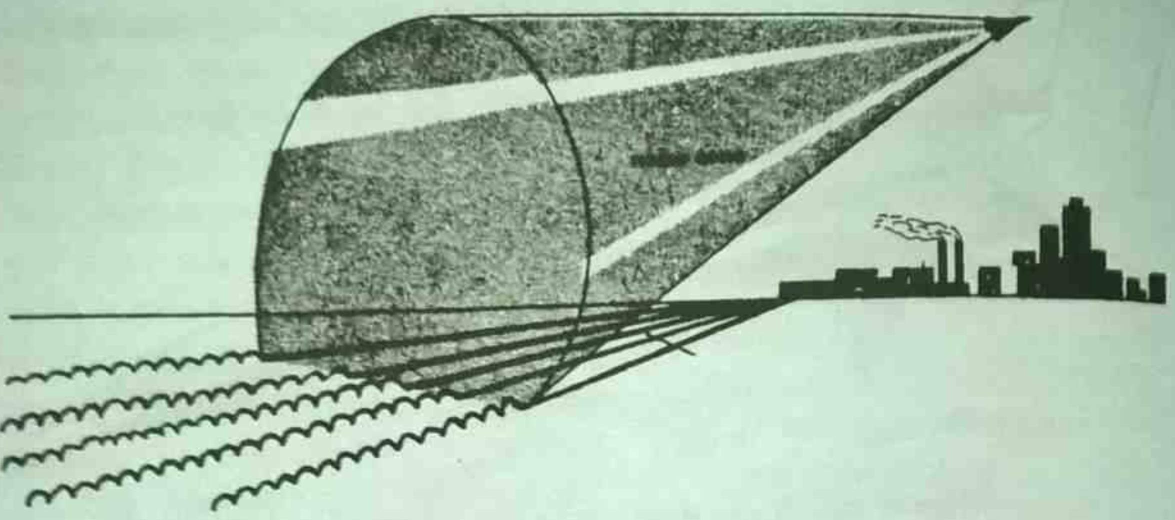
তরঙ্গ। এই আলোড়িত জল AB ও CB রেখা বরাবর স্থির জলের সঙ্গে সংঘাত ঘটায়।

অধিশ্রব বায়ুযানের ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটে। যেহেতু যানটি উড়ে চলে আকাশপথে, সেহেতু মোটরবোটের ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলের বদলে বায়ুযানের ক্ষেত্রে অভিঘাত তরঙ্গ তৈরি হয় শঙ্কুর আকারে। এই শঙ্কুটিকে 'মাক শঙ্কু' বা অপস্বর শঙ্কু বলা হয়। মাক শঙ্কুর বাইরে থাকে সাধারণ চাপের বায়ু। ফলে শঙ্কুর তল বরাবর তৈরি হয় বায়ু চাপের তফাত। এই শঙ্কু যখন কোনো বাড়িতে আঘাত করে তখন ছোটখাটো বাজ পড়ার মতো শব্দ হয়। কম্পন তেমন জোরালো হলে বাড়ির কাচের জানলা চুরমার হয়ে যেতে পারে। এই আকস্মিক সংঘাতের শব্দকে বলা হয় 'সনিক বুম' বা 'সনিক ব্যাং'। একটি অধিশ্রব বায়ুযান উড়ে যাওয়ার সময় মাক শঙ্কুর বাইরে যদি কোনও পর্যবেক্ষক থাকে তাহলে কোনো শব্দই সে শুনতে পাবে না। কিন্তু শঙ্কুর তল যখন তাকে ছেদ করবে তখনই সে আকস্মিকভাবে শুনতে পাবে প্রচণ্ড শব্দ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাক শঙ্কুতে শব্দের চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 2 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

মাক শঙ্কুর নামকরণ হয়েছে অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী আর্নস্ট মাকের নামে। শব্দের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নানান গবেষণা করে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। অধিশ্রব গতিবেগের একটি এককের নামকরণও হয়েছে এই বিজ্ঞানীর নামে—'মাক'।

বায়ুতে শব্দের গতিকে বলা হয় 1 মাক। যে-বায়ুযান শব্দের চেয়ে x গুণ গতিতে চলে তার গতিবেগকে বলা হয় x মাক। অধিশ্রব বায়ুযানের গতিবেগ সাধারণত মাক এককেই প্রকাশ করা হয়।

1947 সালে প্রথম অধিশ্রব গতিতে আকাশে উড়েছিল আমেরিকার 'বেল এক্স-ওয়ান' এরোপ্লেন। তারপর কারিগরি উন্নতি হয়ে সত্তরের দশকে অধিশ্রব যান আরও জনপ্রিয় হয়।



সুপারসনিক জেট চলার জন্য তৈরি হয় 'বো ওয়েভ', আর তা থেকে তৈরি হয় 'নয়েজ' বা অপস্বর

যাত্রীবাহী অধিশ্রব যানও এখন চালু হয়েছে। এরকমই একটি এরোপ্লেন, কঁকর্দ্‌-এর গতি হল 2.2 মাক।

বাতাস কেটে সহজে এগিয়ে চলার সুবিধের জন্য অধিশ্রব যানের মুখ ছুঁচলো হয়। এ ছাড়া পিছুটান কমানোর জন্য তাদের ডানার মাপ ছোটো হয়। গতি সাধারণ এরোপ্লেনের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় ছোটো ডানা দিয়েই এরা প্রয়োজনীয় উত্থানবল তৈরি করতে পারে। মাক শঙ্কুর চাপ থেকে ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বাঁচাতে অধিশ্রব যান অন্তত 900-1000 মিটার উঁচু দিয়ে যাতায়াত করে।

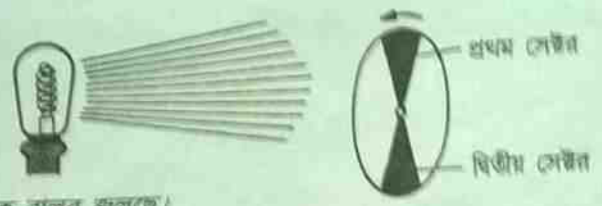


স্ট্রোবোস্কোপ

'স্ট্রোবোস্কোপ' কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'স্ট্রোবোস' ও 'স্কোপ' থেকে। গ্রিক ভাষায় 'স্ট্রোবোস' মানে হল ঘূর্ণমান এবং 'স্কোপ' শব্দটির অর্থ হল দৃষ্টি—দুইয়ে মিলে ইংরেজিতে স্ট্রোবোস্কোপ। বাংলাতেও স্ট্রোবোস্কোপ নামটিই বেশি চালু, যদিও 'ভ্রমিদৃক্' নামে এর একটি পরিভাষাও আছে।

স্ট্রোবোস্কোপ ক্রিয়ার মূল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে আমাদের চোখ ও দৃষ্টির কলাকৌশলের মধ্যে। আমাদের চোখ যে-জিনিস দ্যাখে তার ছায়া পড়ে 'রেটিনা' বা অক্ষিপটের ওপরে। এই ছায়াটিকে রেটিনা ধরে রাখে $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড। $\frac{1}{10}$ সেকেন্ডের পর ছায়াটি ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তবে তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। মোটামুটিভাবে $\frac{1}{15}$ সেকেন্ড পর্যন্ত ছায়াটি ধরা থাকে অক্ষিপটে। এই ঘটনাকে বলে 'পারসিস্টেন্স অফ ভিশান' বা 'দৃষ্টির স্থায়িত্ব'। এর ফলে কোনো জিনিস আমাদের চোখের সামনে এনে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিলেও রেটিনায় সেই জিনিসটির ছায়া $\frac{1}{15}$ সেকেন্ড পর্যন্ত থেকে যায়। ফলে $\frac{1}{15}$ সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের চোখ সেটিকে দেখতে পায়—যদিও বস্তুটি তখন আর আমাদের চোখের সামনে নেই।

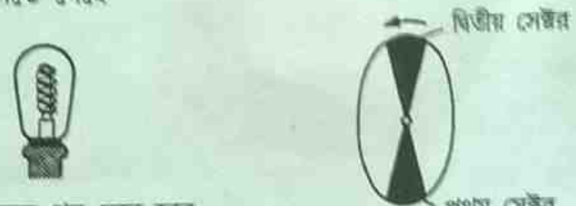
এমনিতে মনে হতে পারে 'দৃষ্টির স্থায়িত্ব' আমাদের পক্ষে অসুবিধেজনক, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। রেটিনার এই বিচিত্র ধর্মের জন্যই আমাদের পক্ষে সিনেমা, টেলিভিশন



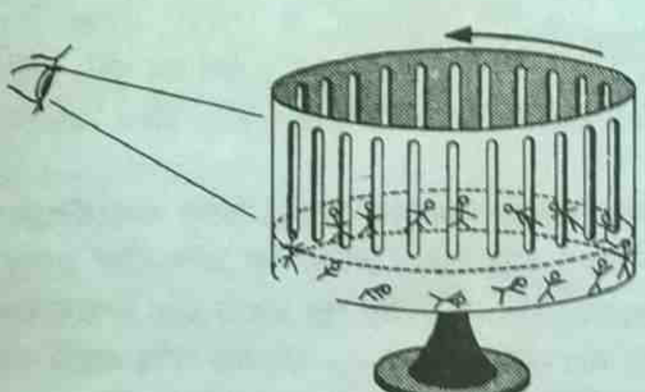
বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলছে।
প্রতি সেকেন্ডে 100টি আলোর ঝলক



$\frac{1}{200}$ সেকেন্ড পর মনে হবে
বাল্‌ব নিভে গেছে



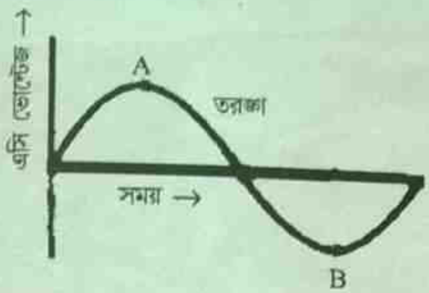
$\frac{1}{100}$ সেকেন্ড পর মনে হবে
বাল্‌ব আবার জ্বলছে



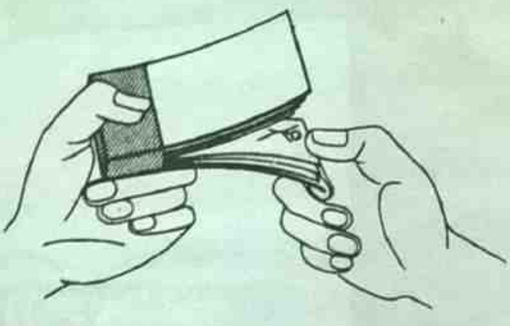
স্ট্রোবোস্কোপ

ইত্যাদি উপভোগ করা সম্ভব হয়। আমরা যে-চলচ্চিত্র দেখি তাতে এক সেকেন্ডে কমপক্ষে পঁচিশটি ধারাবাহিক ছবি দেখানো হয়। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে এক-একটি ছবির স্থায়িত্ব $\frac{1}{25}$ সেকেন্ড ($\frac{1}{15}$ সেকেন্ডেরও কম)। ফলে আমাদের চোখ একটানা চলচ্চিত্র দ্যাখে। দ্যাখে কোনো মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে, কথা বলছে। টেলিভিশনের বেলাতেও এক সেকেন্ডে পঁচিশটি ছবি (যাকে পরিভাষায় বলে 'ফ্রেম') দেখানো হয়।

পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব। এ. সি. ভোল্টেজ দিয়ে বাল্‌বটিকে জ্বালানো হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এ. সি. ভোল্টেজ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার ওঠা-নামা করে —অর্থাৎ, তার কম্পাঙ্ক 50 সাইকেল্‌স্ পার সেকেন্ড অথবা হার্ৎজ। অতএব বাল্‌বটি প্রতি সেকেন্ডে 100 বার উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠবে এবং 100 বার সম্পূর্ণ নিভে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়িতেও তো আমরা এ. সি. ভোল্টেজে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ব্যবহার করি। তাহলে সেখানে 100 বার জ্বলা-নেভার ব্যাপারটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না কেন? এর উত্তর খুব সহজ : দৃষ্টির স্থায়িত্ব। বৈদ্যুতিক বাল্‌বটি সেকেন্ডে 15 বার-এর বেশি জ্বলা-নেভা করলেই আমাদের চোখ সেই ব্যাপারটা আর টের পায় না। বাল্‌বটির জ্বলন্ত অবস্থায়



এসি ভোল্টেজের একটি তরঙ্গ। 1 সেকেন্ডে এরকম 50টি তরঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। তরঙ্গের A এবং B বিন্দুতে বাল্‌ব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে।



স্ট্রোব ক্রিয়ার ব্যবহার। ছবির বইয়ের পাতা দ্রুত উলটে গেলেই চলমান ছবি দেখা যায়।

যে-আলোকরশ্মি রেটিনায় পৌঁছয়, রেটিনা তার ধর্ম অনুসারে সেই ছবিকেই ধরে রাখে। অর্থাৎ, আমাদের চোখ দ্যাখে যে, বাল্‌বটি 'সর্বক্ষণই' উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে।

এবারে ধরা যাক, ছবিতে বৈদ্যুতিক বাল্‌বটির সামনে রাখা হল একটি ঘূর্ণমান চক্র। চক্রের ত্রিভুজাকৃতি দুটি অংশের রং কালো। এই অংশদুটি পরস্পরের বিপরীতমুখী। চক্রের বাকি অংশ সাদা। বৈদ্যুতিক বাল্‌বটি যে-অল্প সময়ের জন্য নিভে থাকে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে যদি চক্রটি 180^0 ডিগ্রি বা অর্ধেকটা ঘুরে যেতে পারে, তাহলে বাল্‌ব যখন আবার উজ্জ্বল হবে তখন দেখা যাবে চক্রটির নীচের ত্রিভুজাকৃতি অংশটি ওপরে চলে এসেছে, আর ওপরের অংশটি চলে গেছে নীচে। অর্থাৎ, ত্রিভুজাকৃতি অংশ দুটি পরস্পরের সঙ্গো জায়গা বদল করেছে। ঠিক এইভাবে জ্বলা-নেভার সঙ্গো তাল মিলিয়ে চক্রটি যদি ক্রমাগত ঘুরে যেতে পারে তা হলে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো দর্শকের কাছে মনে হবে চক্রটি 'স্থিরভাবে থেমে রয়েছে'। এর কারণ, বাল্‌বের জ্বলা-নেভার কম্পাঙ্ক (50 হার্ৎজ) মিলে গেছে চক্রের কম্পাঙ্কের সঙ্গো। যদি চক্রের কম্পাঙ্ক পঞ্চাশের কম হয়, তাহলে মনে হবে ত্রিভুজাকৃতি অংশ দুটি চক্রের বিপরীত দিকে ঘুরে চলেছে। আবার কম্পাঙ্ক পঞ্চাশের বেশি হলে মনে হবে ত্রিভুজাকৃতি অংশ দুটি চক্রের গতির দিকেই ধীরে-ধীরে ঘুরছে। এর কারণ হল, বাল্‌বটি পরপর দুবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠার ফাঁকে চক্রটি প্রথমবারে 180 ডিগ্রির কম ঘুরেছে, আর দ্বিতীয়বারে ঘুরেছে 180 ডিগ্রির বেশি। চক্রের ত্রিভুজাকৃতি অংশ দুটির এই আপাত ঘূর্ণনের কম্পাঙ্ক বাল্‌বের জ্বলা-নেভার কম্পাঙ্ক এবং চক্রের আবর্তনের কম্পাঙ্কের বিয়োগফলের সমান।

এ ধরনের ঘটনা অনেক সময় সিনেমার পরদায় তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে। যেমন, কোনো ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ি বা সাইকেলের চাকা মনে হয় যেন উলটো দিকে ঘুরছে। এর কারণ, চলচ্চিত্র দেখানোর সময় এক সেকেন্ডে যে-ক'টি ধারাবাহিক ছবি (ফ্রেম) দেখানো হয়, সেই হার বা কম্পাঙ্কের সঙ্গো ঘুরন্ত চাকাটির কম্পাঙ্কের তফাত থাকে।



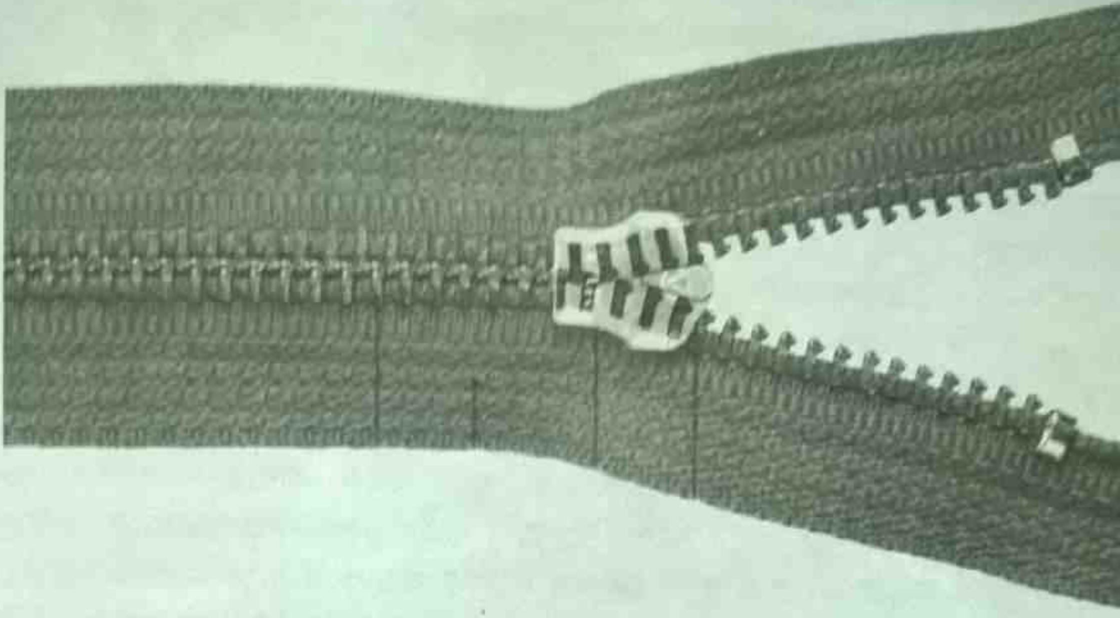
নানানরকম স্ট্রোবোস্কোপ

একই কারণে কখনও-কখনও মনে হয় চাকার স্পোকগুলো স্থির হয়ে থেমে আছে। তখন বুঝতে হবে দুটি কম্পাঙ্ক সমান হয়ে গেছে।

একসময়ে আমাদের এখানে একরকম মজার বই পাওয়া যেত। সেই বইতে প্রতি পৃষ্ঠায় কার্টুন ছবির মাধ্যমে একটা গল্প তুলে ধরা হত। বইটিকে চেপে ধরে ফরফর করে খুব দ্রুত পাতাগুলো উলটে গেলেই মনে হত কার্টুন ছবির চরিত্রগুলো চলাফেরা করছে—অনেকটা ঠিক সিনেমারই মতো। এটাও স্ট্রোবোস্কোপ ক্রিয়ারই ফল।

প্রযুক্তিবিদ্যায় 'স্ট্রোবোস্কোপ' নামে একটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের কাজ হল স্ট্রোবোস্কোপ ক্রিয়ার সাহায্যে মোটর, জেনারেটর, পুলি, গিয়ার, শ্যাফ্‌ট প্রভৃতি ঘূর্ণমান জিনিসের আবর্তনের গতি মেপে বের করা। এ ছাড়া উড়তে পারে এমন সব কীটপতঙ্গের ডানার ওঠা-নামার হার মাপতেও স্ট্রোবোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

খুব বেশি কম্পাঙ্কের যে-কোনো পর্যাবৃত্ত গতিকে (পিরিয়ডিক মোশান) স্ট্রোবোস্কোপ ক্রিয়ার প্রয়োগে আপাতভাবে অনেক কম কম্পাঙ্কের গতিতে পরিণত করা যায়। এর ফলে, কম্পনশীল বস্তুটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।



জিপার বা চেইন

জিপার বা চেইন তোমরা সবাই দেখেছ। শৌখিন টি-শার্ট অথবা প্যান্টে বোতামের বদলে জিপার ব্যবহার করাটা এখন তো নিয়মের মধ্যেই পড়ে গেছে। জিপার সাধারণত ধাতু অথবা প্লাস্টিকের তৈরি হয়। এটি আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার হুইটকোম্ব এল. জাডসন, 1893 সালে।

1893 সালে জাডসন যখন তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেন, তখন এর নাম ছিল 'স্লাইড ফাসনার'। সেসময়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার জুতো পরা পুরুষদের ফ্যাশান ছিল। এই জুতোর বোতাম লাগানো ছিল ভীষণ ঝকমারির কাজ। সেই কাজকে সহজ করতেই জাডসন স্লাইড ফাসনার আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ফাসনার ব্যবহার করাটাও বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ছিল।

জাডসনের আবিষ্কারের কুড়ি বছর পর আধুনিক জিপারের পথ দেখালেন সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ার গিডিয়ন সান্ডব্যাক। ফাসনারকে উন্নত করার জন্য সান্ডব্যাককে জাডসনই নিয়োগ করেছিলেন। সান্ডব্যাকের উন্নত ফাসনারের নাম ছিল 'হুকলেস টু'। এই ফাসনার প্রায় আধুনিক জিপারেরই মতন।

1918 সালে আমেরিকান নেভি তার কর্মীদের 'উইন্ড চিটিং ফ্লাইং স্যুট'-এ ব্যবহারের জন্য 10,000 জিপ ফাসনারের অর্ডার দেয়। এরপরই জিপার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জিপারের মূল অংশ হল দাঁতওয়ালা দুটো চেইন আর একটা ওঠা-নামা করা স্লাইড বা চাবি। এই চাবিকে 'রানার' বলা হয়। চেইনের দাঁতগুলো সাধারণত কাপড়ের ফিতের ওপরে

আটকানো থাকে। আর রানার হল জিপারের চাবিকাঠি। এটা ওঠা-নামা করিয়েই জিপার খোলা-বন্ধ করা হয়। জিপারের চেইনের দাঁতগুলোর গঠন একটু বিশেষ ধরনের—অনেকটা টুপির মতো উঁচু। আর টুপির ঠিক নীচেই থাকে ফাঁকা গর্ত। গর্তের মাপটা এমন যাতে ঠিক নীচের দাঁতের উঁচু অংশ ওপরের দাঁতের গর্তের মধ্যে একেবারে খাপে-খাপে বসে যায়। সেইজন্যই দাঁতওয়ালা চেইন দুটো সামান্য ওপরে-নীচে সরানো থাকে। জিপার বন্ধ করতে হলে দুটো দাঁতের সারিকে এমনভাবে এঁটে দেওয়া দরকার যাতে দু-দিকের দুটো করে দাঁত পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে যায়। এই কাজটি করে রানার। রানারের মধ্যে Y অক্ষরের মতো একটা সুড়ঙ্গ থাকে। রানার ওপরদিকে টেনে তুললে Y-এর ওপরের দুটো বাহুর দুটো দাঁতওয়ালা চেইন ঢুকে পড়ে রানারের ভিতরে। তারপর রানারের যান্ত্রিক কারিগরি দুটো চেইনের দাঁতকে কাছাকাছি নিয়ে এসে সঠিকভাবে চাপ দেয়। ফলে দু-দিকের দাঁতে-দাঁতে এঁটে গিয়ে Y-এর নীচের পথ দিয়ে বন্ধ জিপারটা বেরিয়ে আসে। জিপার খুলতে গেলে ঠিক উলটো কাজটি করতে হয়। অর্থাৎ, রানার টেনে নামাতে হয় নীচে। ওঠা-নামা করার সময় রানার যাতে জিপার থেকে একেবারে খুলে বেরিয়ে না যায় তার জন্য দাঁতওয়ালা চেইন দুটোর ওপরে ও নীচে দুটো ধাতব অংশ আটকানো থাকে। কোনো-কোনো জিপারের ক্ষেত্রে দাঁতওয়ালা চেইন দুটোকে একেবারে আলাদা করে ফেলা যায়। যেমন জ্যাকেটে লাগানো জিপার। এ জাতীয় জিপারে নীচের ধাতব অংশটা এমনভাবে তৈরি যে, একটা দাঁতওয়ালা চেইন চাবি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু অন্যটা পারে না।



দুটো দাঁত পরস্পরের সঙ্গে এঁটে গেছে



ধাতুর তৈরি জিপার *প্লাস্টিকের তৈরি জিপার*

যেসব জিপারে প্লাস্টিকের দাঁত থাকে তাদের দাঁতের গড়ন একটু ভিন্ন রকমের হয়। এ ছাড়াও নানা গড়নের জিপার তোমাদের চোখে পড়তে পারে, কিন্তু জেনে রেখো, তাদের কাজ করার নীতি কিন্তু একইরকম।



বজ্রনিবারক

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে আমেরিকার বস্টন শহরে একজন গরিব মানুষ বাস করত। তার পেশা ছিল মোমবাতি তৈরি করা। তার ছেলেমেয়ে ছিল সতেরোটি। সতেরোর মধ্যে পনেরো নম্বর যে-ছেলেটি সে-ই আবিষ্কার করেছিল বজ্রনিবারক। ছেলেটির প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সে ছিল একাধারে লেখক, মুদ্রাকর, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক এবং বিজ্ঞানী। অথচ নিয়মমাফিক পড়াশোনা করেছিল মাত্র দু-বছর। এখনও যদি সেই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর পরিচয় তোমরা আঁচ না করতে পারো তাহলে তাঁর একটা ঐতিহাসিক পরীক্ষার কথা বলি, তাহলেই তাঁর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। 1752 সালের এক ঝড়বৃষ্টির বিকেলে এই বিজ্ঞানী মহাশয় তামার তারকে সুতো হিসেবে ব্যবহার করে আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে মেঘ থেকে পাকড়াও করেছিলেন বিদ্যুৎ। অতএব আর লুকোচুরি করে লাভ নেই। স্বনামধন্য সেই বিজ্ঞানীর নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

মার্কিন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন 'লাইটনিং অ্যারেস্টার' বা 'বজ্রনিবারক' আবিষ্কার



বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তারটিকে মাটির নীচে 'আর্থ' করা হয়েছে

করার কয়েক বছরের মধ্যেই জিনিসটা খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। তিনি তখন থাকতেন ফিলাডেলফিয়াতে। 1782 সালে শুধু ফিলাডেলফিয়াতেই বিভিন্ন বাড়িতে চারশো বজ্রনিবারক চালু ছিল। মোটামুটিভাবে 1752 সালকেই বজ্রনিবারক আবিষ্কারের বছর বলে ধরা হয়, কারণ, ওই ঘুড়ি ওড়ানোর পরীক্ষা থেকেই বজ্রনিবারকের মূলতত্ত্ব ফ্রাঙ্কলিনের আয়ত্তে আসে।

বজ্রনিবারক জিনিসটি নিছকই একটি ধাতব রড। রডের ছুঁচলো মুখটা টিভির অ্যানটেনার মতো বসানো থাকে বাড়ির মাথায়। অনেক সময় বজ্রনিবারকের একাধিক ছুঁচলো মুখ থাকে—অনেকটা ত্রিশূলের মতো। এই ছুঁচলো মুখ থেকে বিদ্যুৎ-সুপরিবাহী তার বাড়ির গা বেয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় মাটির নীচে। সেখানে তারটিকে বেশ ভালোভাবে মাটির নীচে ঢুকিয়ে 'আর্থ' করে দেওয়া হয়। এর ফলে বজ্রপাতের বিদ্যুৎ বজ্রনিবারকের ছুঁচলো মুখ দিয়ে ঢুকে সুপরিবাহী তার বেয়ে সোজা চলে যায় মাটিতে। বিদ্যুৎপ্রবাহ এরকম সহজ পথ পেয়ে যাওয়ার ফলে বজ্রপাতে বাড়ির কোনো ক্ষতি হয় না। বজ্রনিবারক না থাকলে মেঘ থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বাড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাটিতে যাওয়ার চেষ্টা করত। ফলে হাই


বজ্রনিবারকের প্রান্ত সূচিতীক্ষ্ণ হওয়ার ফলে বিদ্যুৎক্ষেত্রের বলরেখাগুলো ঘনীভূত হয়



বজ্রনিবারকের সূচিমুখের কাছে আয়নিত বায়ু



নানানরকম বজ্রনিবারক

ভোল্টেজ-এর বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে বাড়ির ভীষণ ক্ষতি হত। ঠিক একই কারণে বাজ পড়ে তাল গাছ বা নারকোল গাছ পুড়ে যায়।

এমনিতে কোনো বাড়ির দেওয়াল বা গাছ বিদ্যুতের কুপরিবাহী, কিন্তু মেঘজাত বিদ্যুতের পরিমাণ অনেক বেশি—বজ্রপাতের সময় মোটামুটিভাবে তিরিশ হাজার থেকে দু-লক্ষ ভোল্ট পর্যন্ত বিভব প্রভেদ তৈরি হয়। যেখানে আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎবাহী তারে এ. সি. ভোল্টেজ থাকে মাত্র দুশো চল্লিশ ভোল্ট। সুতরাং বুঝতেই পারছ, অত্যন্ত ভোল্টেজের বিভব প্রভেদ হওয়ার ফলেই কুপরিবাহী বস্তুও তড়িৎ পরিবহণ করে।

বজ্রনিবারকের মাথায় ছুঁচলো মুখ রাখার বিশেষ কারণ আছে। উচ্চবিভব সম্পন্ন মেঘের তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখাগুলো বজ্র নিবারকের ছুঁচলো মুখের কাছে খুব ঘন হয়ে থাকে। ফলে তার কাছাকাছি বায়ু আয়নিত হয়ে যায়—অর্থাৎ, ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে পড়ে। তখন বাতাসে থেকে যায় শুধু ধনাত্মক আধান, যার ফলে ওই আয়নিত বাতাস হয়ে ওঠে তড়িৎপরিবাহী। তখন মেঘজাত উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ পৃথিবীতে নেমে আসার জন্য ওই সুপরিবাহী সহজ পথ বেছে নেয় এবং বজ্রনিবারকের গুণে বাড়িটা রক্ষা পায়।

খোলামেলা জায়গায় যে-উচ্চতার বাড়ি বজ্রপাতের জন্য বিপজ্জনক, ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে একই উচ্চতার বাড়ি কিন্তু ততটা বিপজ্জনক নয়।



বৈদ্যুতিক ইস্তিরি

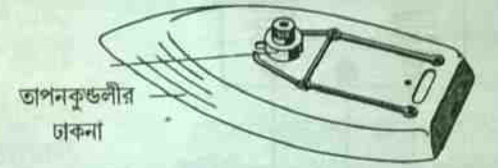
জামাকাপড় কাচার পর ইস্তিরি না করলে কেমন বিশ্রী দেখায়। বিশেষ করে সুতির জামাকাপড় তো ইস্তিরি না করে গায়ে তোলাই ভার! আর এই ইস্তিরি করার কাজে আমাদের প্রধান সহায় বৈদ্যুতিক ইস্তিরি।

ইস্তিরির বহু রকমফেরের পর আমরা হাতে পেয়েছি আজকের বৈদ্যুতিক ইস্তিরি। আধুনিক এই যন্ত্রটির শুরু হয়েছিল আটের শতকে। কারণ মোটামুটিভাবে সেই সময় থেকেই সুতির কাপড় উৎপাদনের হার বেশ বেড়ে ওঠে। আটের শতকে চিনদেশে যে-ইস্তিরি ব্যবহার করা হত তার চেহারা ছিল লম্বা হাতলওয়ালা খুদে সসপ্যানের মতো। কাঠকয়লার আগুনে এই ইস্তিরি গরম করে তা দিয়ে রেশমি কাপড় ইস্তিরি করা হত।

আনুমানিক 1600 খ্রিস্টাব্দ থেকে ওলন্দাজ দরজিরা বড় মাপের ফাঁপা বাক্সের মতো এক ধরনের ইস্তিরি ব্যবহার করতেন। এই ইস্তিরি গরম করার জন্য তার পিছনের ঢাকনা খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত একটা গনগনে লাল লোহার টুকরো। 1738 সালে এ ধরনের ইস্তিরির পেটেন্ট নিয়েছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের লোহা-উৎপাদনকারী আইজ্যাক উইলকিনসন। আঠেরো শতকে ঢালাই লোহার তৈরি ভারী ইস্তিরির সবচেয়ে বেশি চল ছিল। এই ইস্তিরি জোড়ায়-জোড়ায় ব্যবহার করা হত। একটা দিয়ে যখন ইস্তিরি করা হত, তখন অন্যটা গরম হত আগুনে। আমাদের দেশে পুরোনো ধাঁচের কিছু-কিছু লন্ড্রিতে এরকম লোহার হাতলওয়ালা জোড়া ইস্তিরি এখনও ব্যবহার করা হয়। আরও পরের দিকে পিতল বা লোহার তৈরি ফাঁপা

বাক্সের মতো একরকম ইস্তিরি চালু হয়েছিল। এই ইস্তিরিতে চিমনি লাগানো থাকত। আর ইস্তিরি গরম করা হত জ্বলন্ত কাঠকয়লা দিয়ে। 1960-এর দশকেও ইউরোপে এই ইস্তিরি হাজারে-হাজারে তৈরি হত। তারপর সেগুলো চালান যেত পৃথিবীর নানা দেশে—বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে তেমনভাবে বিদ্যুতের চল হয়নি।





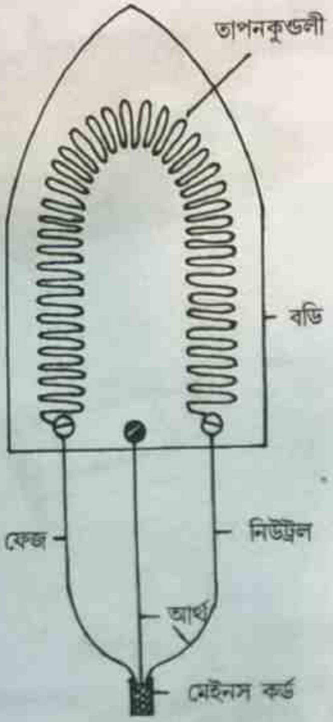


বৈদ্যুতিক ইস্তিরির নানান অংশ

গরম কাঠকয়লা বা লোহা ছাড়াও গ্যাসের সাহায্যে ইস্তিরি গরম করার পদ্ধতি কেউ-কেউ শুরু করেছিলেন 1850-এর দশকে। তারপর 1882-তে নিউ জার্সির হেনরি সিলি প্রথম বৈদ্যুতিক ইস্তিরি আবিষ্কার করেন। এই ইস্তিরিতে ইস্তিরি করার লোহার খণ্ডটিকে একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উত্তপ্ত করত। এরপর মিনিয়াপোলিসের একটি রেস্তরাঁর ক্যাশিয়ার চার্লস কার্পেন্টার একটু উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক ইস্তিরি আবিষ্কার করেন। এতে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে একটি তারের টুকরো বা লোহার টুকরোকে গরম করে তার মাধ্যমে ইস্তিরির প্লেটটিকে গরম করা হত। আজকের আধুনিক বৈদ্যুতিক ইস্তিরি মোটামুটিভাবে এই নীতির ওপর নির্ভর করেই তৈরি।

কিন্তু ঠিক কীভাবে কাজ করে বৈদ্যুতিক ইস্তিরি?

একটি বৈদ্যুতিক ইস্তিরির মূল অংশগুলো হল, সোল প্লেট, ইন্টারমিডিয়েট প্লেট, আধুনিক ছাঁদের হাতলসমেত একটি ঢাকনা, 'হিটিং কয়েল' বা তাপনকুণ্ডলী, উষ্ণতা নির্বাচনী চাকতি ও একটি ছোটো রঙিন বাতি। বৈদ্যুতিক ইস্তিরি থেকে যে-মেইন্‌স কর্ড বেরিয়ে আসে তার মধ্যে তিনটি বৈদ্যুতিক তার থাকে। সেই কারণেই মেইন্‌স কর্ডের শেষ প্রান্তে যে-প্লাগ লাগানো থাকে তাতে তিনটি তারের জন্য তিনটি পিন থাকে—ফলে এই প্লাগকে আমরা বলি থ্রি-পিন প্লাগ। তিনটি পিনের মধ্যে সবচেয়ে মোটা পিনটি আর্থ লাইনে সংযুক্ত থাকে বলে এই পিনটিকে আর্থ পিন বলা হয়। বাড়ির এ. সি. সাপ্লাই লাইনের সকেটে প্লাগটি যখন গুঁজে দেওয়া হয় তখন একটি তার ফেজ, একটি নিউট্রল, আর শেষ তারটি আর্থ লাইনে সংযোজিত হয়। বৈদ্যুতিক ইস্তিরি 'অন' করলে তার তাপনকুণ্ডলীর দু-প্রান্তে ফেজ ও

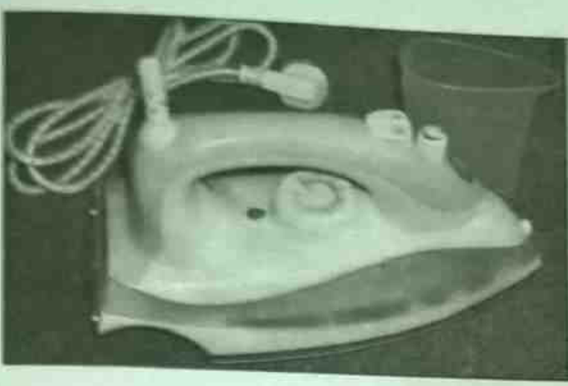


এ সি ভোল্টেজ সাপ্লাই থেকে তিনটে তার এইভাবে বৈদ্যুতিক ইস্তিরির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

নিউট্রল যুক্ত হয়। আর আর্থ লাইনটি যুক্ত হয়ে যায় ইস্তিরির ইস্পাতের শরীরে বা বডিতে। এর ফলে অন অবস্থায় ইস্তিরির গায়ে হাত দিলেও আমাদের শক খাওয়ার ভয় থাকে না। ব্যবহারকারীর নিরাপত্তার কথা ভেবেই এরকম ব্যবস্থা করা থাকে।

ফেজ বা নিউট্রল লাইনের মাধ্যমে ভোল্টেজ সাপ্লাই পেয়ে তাপনকুণ্ডলী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই তাপ সোল প্লেটের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায় জামাকাপড়ে। তখন ইস্তিরি করতে কোনোরকম অসুবিধে হয় না। 'টেম্পারেচার সিলেক্টর' বা 'উষ্ণতা নির্বাচনী' চাকতির সাহায্যে আমরা বৈদ্যুতিক ইস্তিরির সোল প্লেটের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই চাকতির কিনারায় সুতি, সিল্ক, উল ইত্যাদি শব্দ লেখা থাকে। সুতির জামাকাপড় ইস্তিরি করতে চাইলে চাকতিকে ঘুরিয়ে সুতির জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানে রাখতে হবে। আবার উলের জিনিস ইস্তিরি করতে চাইলে চাকতি সেইমতো ঘুরিয়ে নিতে হবে। নির্বাচনী চাকতির অবস্থান অনুযায়ী তাপনকুণ্ডলীর বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে উষ্ণতাও হয়ে যায় নিয়ন্ত্রিত। অন-অফ পদ্ধতিতে তাপনকুণ্ডলীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, উষ্ণতা বেড়ে গেলে তাপনকুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়, আবার উষ্ণতা কমে গেলে বর্তনী সংযুক্ত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ করা হয় থার্মোস্ট্যাটের সাহায্যে। থার্মোস্ট্যাটের ধাতব পাতটি সাধারণত ইনভার-এর (ভরের অনুপাতে 63.8% লোহা, 36% নিকেল ও 0.2% কার্বন) তৈরি হয়। উষ্ণতা পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট প্লেটের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হয়। সেই অনুযায়ী ইনভার পাতটি তাপনকুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক বর্তনী সংযুক্ত করে বা বিচ্ছিন্ন করে।

বৈদ্যুতিক ইস্তিরির রঙিন বাতির কাজ হল তাপনকুণ্ডলীর বর্তনী সংযুক্ত না বিচ্ছিন্ন তা ব্যবহারকারীকে জানিয়ে দেওয়া। উষ্ণতা যখন প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে তখন তাপনকুণ্ডলীর বর্তনী সংযুক্ত থাকে এবং বাতি জ্বলতে থাকে। উষ্ণতা দরকারি মানের সমান হওয়ামাত্রই বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয় এবং রঙিন বাতিটি নিভে যায়। এই বাতি বারবার অন-অফ হওয়ার অর্থই হল থার্মোস্ট্যাট ঠিকমতো কাজ করছে এবং উষ্ণতাও নির্দিষ্ট মানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে উষ্ণতা নির্দিষ্ট মানের দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, যদি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উষ্ণতা হয় 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে এই ধরনের





থার্মোস্ট্যাট-নিয়ন্ত্রণ উষ্ণতাকে সবসময় 60 থেকে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে পারে। তাপনকুণ্ডলী থেকে উৎপন্ন তাপের যেন অপচয় না ঘটে সেজন্য বৈদ্যুতিক ইস্তিরিতে যথাযথভাবে 'থার্মাল-ইনসুলেশান' বা তাপ-অন্তরক আচ্ছাদন দেওয়া থাকে। এর ফলে উৎপন্ন তাপের বেশিরভাগটাই সঞ্চালিত হয় সোল প্লেটের দিকে। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক ইস্তিরিতে তাপনকুণ্ডলীর দুপাশে অভ্রের পাতলা চাদর ব্যবহার করা হয়। এই চাদর বিদ্যুতের অন্তরক হিসেবে কাজ করে। ফলে ব্যবহারকারীর বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার ভয় থাকে না। তবে গরম ইস্তিরিতে হাত দিলে হাত পুড়বেই। তার জন্য একমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা হল সতর্কতা।



প্রেশার কুকার

খোলা সসপ্যানে আলু সেদ্ধ করতে গেলে অন্তত কুড়ি কি তিরিশ মিনিট লাগবে। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, বাড়িতে আলু বা কোনো কিছু সেদ্ধ করার সময় সসপ্যান কিংবা হাঁড়ির মুখে ঢাকনা বসিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, এতে সেদ্ধ হওয়ার কাজটা হয় জলদি।

যদি হাঁড়ি বা সসপ্যানের বদলে প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করার কাজটা করা হয়, তাহলে সময় লাগবে কুড়ি কি তিরিশ মিনিটের জায়গায় মাত্র চার কি পাঁচ মিনিট। এই কারণেই আজ প্রেশার কুকার এত জনপ্রিয়।

প্রেশার কুকারের শুরু হয়েছিল 'স্টিম ডাইজেস্টার' নামে, 1679 সালে। ডেনিস পাপাঁ নামে এক ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করে পেটেন্ট নেন।

কিন্তু প্রেশার কুকারে রান্না এত তাড়াতাড়ি হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে জলের স্ফুটনাঙ্কের মধ্যে। আমরা জানি, সি-লেভেল বা সমুদ্রপৃষ্ঠে সাধারণ চাপে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জল ফোটে। ফলে খোলা সসপ্যানে আলু সেদ্ধ করার সময় জলের উষ্ণতা মোটামুটিভাবে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারবে না—সসপ্যানে যতই আমরা তাপ দিই না কেন। তাপ বেশি দিলে যেটা হবে সেটা হল, জল ফুটে বাষ্পে রূপান্তরিত হবে।

চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে জলের স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন হয়। যেমন, খোলা সসপ্যানের ওপরে ঢাকনা বসিয়ে দিলে জল ফুটে বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়ার হার কিছুটা কমে যায়। কারণ, ঢাকনা থাকায় জলতলের ওপরে বাষ্পের চাপ বেড়ে যায়। তখন জলের



প্রেশারকুকারের নানান অংশ

স্ফুটনাঙ্কও যায় বেড়ে। কিন্তু সসপ্যানের ঢাকনা ও পাত্রের মাঝে অনেক সময় সামান্য ফাঁক থাকে। তা ছাড়া, বাষ্প চাপ দিয়ে ঢাকনা ঠেলে বেরিয়ে যায় পাত্রের বাইরে। এই কারণেই সাধারণভাবে ঢাকনা বসিয়ে দিলে জলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে না। অনেক সময় ঢাকনার ওপরে ভারী কোনো ওজন বসিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করা হয়। সন্দেহ নেই, এতে জলের স্ফুটনাঙ্ক আরও একটু বেড়ে যায়। ফলে সেদ্ধ হওয়ার কাজটাও হয় একটু তাড়াতাড়ি।

চাপ বাড়লে জলের স্ফুটনাঙ্ক যেমন বেড়ে যায়, চাপ কমে গেলে ঘটে ঠিক উলটো ঘটনা। জলের স্ফুটনাঙ্ক তখন কমে যায়। যেমন, এভারেস্ট-শৃঙ্গের চূড়ায় যদি এক কাপ চা তৈরি করে চুমুক দিতে চাই তাহলে সেই চা মোটেও তেমন সুস্বাদু হবে না। এর কারণ, জলের নেমে যাওয়া স্ফুটনাঙ্ক। এভারেস্ট-শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় 9000 মিটার। সেখানে বায়ুর চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপের শতকরা 30 ভাগ মাত্র। এই চাপে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জল ফোটে। সুতরাং চা পাতা থেকে তার সেরা স্বাদটুকু টেনে বের করতে যে-উষ্ণতায় জল গরম করা দরকার সেই উষ্ণতায় পৌঁছনোই যাবে না। অতএব চায়ের স্বাদও হবে বিস্বাদ।

শুধু চা কেন, আলু সেদ্ধ করতে চাইলেও ঘটবে একইরকম ঘটনা। সময় তো বাড়তি অনেকটা লাগবেই, উপরন্তু আলুও তেমন ভালো সেদ্ধ হবে না।

এইবার আমরা বোধহয় বুঝতে পারছি, প্রেশার কুকার কীভাবে জলের স্ফুটনাঙ্ক



বাড়িয়ে দিয়ে রান্নার কাজ চটজলদি সেরে দেয়। অতিরিক্ত চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় বলে তরিতরকারি রান্নার উষ্ণতাও বেড়ে যায়, আর রান্নাও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

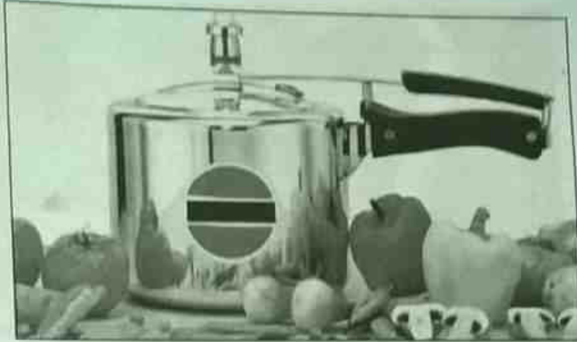
1679 সালে পাপাঁ তাঁর আবিষ্কৃত 'স্টিম ডাইজেস্টার'-এ মাংস রেঁধে দেখিয়েছিলেন যে, উচ্চ চাপে কত তাড়াতাড়ি মাংস সেদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর যন্ত্রে পাত্রের সঙ্গো ঢাকনা নাট-বল্টু দিয়ে শক্ত করে আঁটা ছিল। কিন্তু বাষ্পের চাপ খুব বেশি বেড়ে গেলে পাত্রটি ফেটে গিয়ে বিপদ হতে পারে। সেইজন্য পাপাঁ তাঁর যন্ত্রে একটি 'সেফটি ভাল্‌ভ' বা নিরাপত্তা ভাল্‌ভ লাগিয়েছিলেন। পাত্রের চাপ বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেলেই নিরাপত্তা ভাল্‌ভ খুলে গিয়ে সেখান দিয়ে পাত্রের বাষ্প বেরিয়ে যাবে। ফলে পাত্র ফেটে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না।

আদি প্রেশার কুকার আবিষ্কারের সময় পাপাঁ লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে গবেষণা করছিলেন। এই সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। পাপাঁর আবিষ্কারকে মর্যাদা দিতে 1680 সালে তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য করে নেওয়া হয়। তখনই সোসাইটি তাঁকে নির্দেশ দেয় এই নতুন 'কুকার' সম্পর্কে একটি বই লিখে প্রকাশ করার জন্য। 'নিউ ডাইজেস্টার' নামে এই বই প্রকাশিত হয় 1681 সালে। এ ছাড়া যন্ত্রটির গুণপনা 'হাতেনাতে' পরীক্ষা করে দেখার জন্য সোসাইটি তার সদস্যদের রেঁধে খাওয়ানোর জন্য পাপাঁকে অনুরোধ করেছিল। 1682-র আগস্ট মাসে পাপাঁ তাঁর যন্ত্রে রান্না করা খাবার সোসাইটির সদস্যদের খাইয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শোনা যায়, রাজা দ্বিতীয় চার্লসকেও তিনি এই যন্ত্রে রেঁধে খাইয়ে তৃপ্ত করেছিলেন।

এরপর, 1807 সাল পর্যন্ত, যন্ত্রটি সম্পর্কে খুব একটা কিছু শোনা যায়নি। তারপর খাবার স্বাস্থ্যসম্মত প্যাকিং-এর কাজে এই যন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করেন ফ্রান্সের নিকোলাস অ্যাপার্ট। তবে ঘরে-ঘরে রান্নার কাজের উপযোগী ছোটো প্রেশার কুকার উনিশ শতকের শেষের দিকে তৈরি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু হলে রান্না করা খাদ্য সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের যন্ত্র ইওরোপে জনপ্রিয় হয়।

1905 সাল পর্যন্ত ঘরোয়া প্রেশার কুকার তৈরি হত ঢালাই লোহা দিয়ে। এর প্রথম অ্যালুমিনিয়াম মডেল তৈরি করে আমেরিকার উইসকনসিনের প্রেস্টো কোম্পানি। তখনও পর্যন্ত নাট-বল্টু দিয়ে ঢাকনাটি এঁটে দেওয়া হত পাত্রের সঙ্গো। 1938 সালে শিকাগোর এক ড্রাফট্‌সম্যান অ্যালফ্রেড ভিশার প্রেশার কুকারের নতুন ধরনের একটি নকশা তৈরি করেন।

এই নকশায় ইন্টারলকিং পদ্ধতিতে পাত্র ও ঢাকনা এঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আর পাত্রটিকে চাপ-নিরোধক করার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন রবারের রিং বা গ্যাসকেট। এ ছাড়া তিনি রান্নার কাজের সুবিধের জন্য প্রাত্রের সঙ্গে লম্বা একটি হাতল জুড়ে দিয়েছিলেন।



1954 সালে ভিশারের পেটেন্টের মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে অন্যান্য কোম্পানি প্রেশার কুকার তৈরি শুরু করে। এখন আমরা যেসব প্রেশার কুকার দেখতে পাই তা ভিশারের মডেলের উন্নত রূপ। আধুনিক প্রেশার কুকারে বায়ুমণ্ডলের প্রায় দ্বিগুণ চাপে রান্না হয়। এই চাপের মান প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় দু-কিলোগ্রাম। ফলে প্রেশার কুকারে জল ফোটে প্রায় 122 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায়।

প্রেশার কুকারের ঢাকনার ঠিক মাঝখানে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সরু নল থাকে। নলের ছিদ্রটি খুব সূক্ষ্ম। একটি ভারী ধাতব টুপি সেই ছিদ্রের ওপরে চাপা দিয়ে প্রেশার কুকারকে চাপ-নিরোধক করা হয়। কুকারের চাপ বাড়লে টুপিটি নড়তে থাকে, কখনও-কখনও ওপরে উঠে যায় এবং সরু ছিদ্রটি দিয়ে উচ্চ চাপের বাষ্প বাইরে বেরিয়ে আসে। চাপ কিছুটা কমলেই টুপিটি আবার জায়গামতো বসে কুকারকে চাপ-নিরোধক করে দেয়। এইভাবে কুকারের ভেতরের চাপ একটি নির্দিষ্ট সীমায় নিয়ন্ত্রিত হয়। ছিদ্রটি সরু হওয়ায় বাষ্প বেরোনোর সময়ে শিসের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। একে আমরা চলতি কথায় বলি 'সিটি'। 'সিটি' বেজে ওঠার সংখ্যা থেকেই আমরা অনুমান করি রান্না শেষ হয়েছে কি না।

যদি কোনও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য টুপিটি দরকার মতো ওপরে উঠে ভেতরের অতিরিক্ত চাপ কমাতে না পারে, তাহলে কুকার ফেটে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেইজন্যই কুকারের ঢাকনায় একটি নিরাপত্তা ভাল্‌ভ থাকে। প্রেশার কুকারের পাত্র ও ঢাকনা যাতে সহজে খোলা যায় ও নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করা যায় তার জন্য পাত্রের মুখ ও ঢাকনার আকৃতি উপবৃত্তাকার করা হয়। এর ফলে হাতলের শেষ প্রান্তের লক খুলে ঢাকনাটিকে 90 ডিগ্রি ঘোরালেই ঢাকনা সহজে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসে। ঢাকনার আকৃতি যদি বৃত্তাকার হত তা হলে ঢাকনাটা কুকারের বাইরে বের করা যেত না। কুকারের ঢাকনা ও পাত্রের জোড়ের মুখ বায়ুনিরোধক করার জন্য ঢাকনার কিনারায় লাগানো থাকে একটি রবারের রিং বা গ্যাসকেট। ব্যবহার করতে-করতে গ্যাসকেট ঢিলে হয়ে গেলে এটি অনায়াসে বদলে নেওয়া যায়।

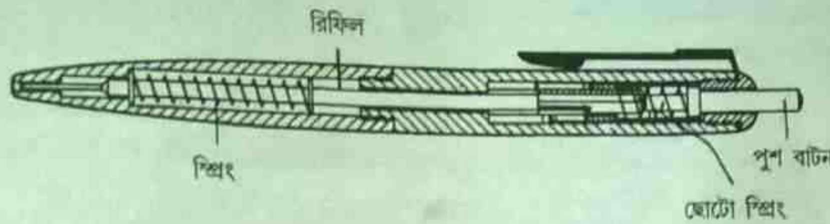


ডট পেন

প্রথম সফল ঝরনা কলম বা ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার এস. ই. ওয়াটারম্যান, 1884 সালে। তার আগে, প্রায় 1000 বছর ধরে, কলম হিসেবে ব্যবহার করা হত পাখির পালকের সূচিমুখ। কিন্তু কালি ও কলম ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধে হল কালি চলকে পড়ে হাত বা জামাকাপড় নোংরা হওয়ার ভয়। তা ছাড়া বারবার কালি ভরার ঝামেলাও কম নয়। আবার ঝরনা কলম নিয়ে এরোপ্লেনে ভ্রমণেরও সমস্যা আছে। প্লেন যখন আকাশপথে উড়ে যায় তখন কম বায়ুচাপের পরিবেশে কলম থেকে কালি চলকে পড়তে পারে বাইরে। আধুনিক প্লেনে অবশ্য এই সমস্যার ভয় নেই, কারণ, এখন প্লেনে পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্লেনকে বায়ুনিরোধক করা হয় এবং প্লেনের ভেতরে এক বায়ুমণ্ডল চাপে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়।

1930-এর দশকে হাঙ্গেরির শিল্পী ও সাংবাদিক লেডিসলাও জোসেফ বিরো যখন বল পয়েন্ট পেন আবিষ্কার করলেন তখন সকলেই সেই আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেন। আবিষ্কারটি ঘটেছিল বুডাপেস্টে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ এড়াতে বিরো চলে গেলেন আর্জেন্টিনায়। ফলে এইভাবেই আর্জেন্টিনাতে বল পয়েন্ট পেন পৌঁছে গিয়েছিল।

লেডিসলাও বিরোর ভাই গিয়র্গ ছিলেন একজন রসায়নবিদ। তিনি ভাইয়ের আবিষ্কারকে



স্প্রিং ও পুশ বাটনযুক্ত বল পয়েন্ট পেন

আরও নিখুঁত করে যুদ্ধের সময়েই বুয়েনস এয়ারস থেকে বল পয়েন্ট পেন নিয়মিতভাবে তৈরি করা শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের আবিষ্কারের যাবতীয় স্বত্ব বিরো ভাইয়েরা হস্তান্তর করে দেন। তখন নতুন মালিক মিত্রশক্তির বিমানবাহিনীর জন্য 'বিরো পেন' তৈরি করতে থাকেন। কারণ, এই পেনের সুবিধে হল, আকাশে বায়ুর চাপ কমে গেলেও এর কালি ঝরনা কলমের মতো বাইরে বেরিয়ে আসে না। বিমানবাহিনীর সৈন্যরা এই পেন ব্যবহার করলেও এর সুবিধেজনক দিকগুলো সাধারণ মানুষের চোখ এড়ায়নি। ফলে লেডিসলাও বিরোর আবিষ্কার ক্রমে পৌঁছে গেল ঘরে-ঘরে। এই বল পয়েন্ট পেনকেই আমরা ডট পেন নামে চিনি।

বল পয়েন্ট পেন নাম থেকেই বোঝা যায় এর মধ্যে একটা বল রয়েছে, এবং এই বলই হল পেনটির প্রাণ। বলটির ব্যাস এক মিলিমিটার। এটি সাধারণত তৈরি করা হয় মাইল্ড স্টিল অথবা স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে। এর উপরিতলকে নিখুঁতভাবে মসৃণ করা হয়। তারপর এই মসৃণ বলকে যান্ত্রিক কৌশলে বসিয়ে দেওয়া হয় রিফিলের মুখে। রিফিলটি সাধারণত পিতল, ইস্পাত কিংবা পলিথিন জাতীয় পদার্থের তৈরি হয়। তবে তার মুখটি সবসময় ধাতুর তৈরি। এই ধাতব মুখে বলটি এমনভাবে বসানো হয় যাতে বলটি সবদিকেই মসৃণভাবে ঘুরতে পারে, অথচ কখনও রিফিলের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। বলটিকে আটকে রাখার জন্য রিফিলের মুখের প্রান্ত ভেতর দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে।

রিফিলের কালি তেল-নির্ভর—ঝরনা কলমের সাধারণ কালির মতো জল-নির্ভর নয়। তাই এই কালি শুকিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। রিফিলের সরু নল দিয়ে এই কালি পৌঁছে যায় বলের পিছনে। রিফিল যখন কাগজে ঘষা হয় তখন বলটি ঘুরতে থাকে, আর তার গা বেয়ে কালি পৌঁছে যায় কাগজে, তৈরি হয় কালির রেখা।

সাধারণ রিফিলের পিছনদিকটা খোলা থাকে। অথবা জটার রিফিল হলে তার শেষ প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখা হয়। যদি রিফিলের পিছনদিকটা নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ থাকত তাহলে কিছুক্ষণ লেখার পরই কালির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত। এর কারণ, বন্ধ রিফিলের ক্ষেত্রে কিছুটা কালি খরচ হওয়ার পরই রিফিলের পিছনদিকের অংশে বায়ুর চাপ কমে যেত। অথচ রিফিলের বলের প্রান্তে বায়ুর চাপ আগের মতোই বজায় আছে। ফলে কালি আর বলের দিক দিয়ে



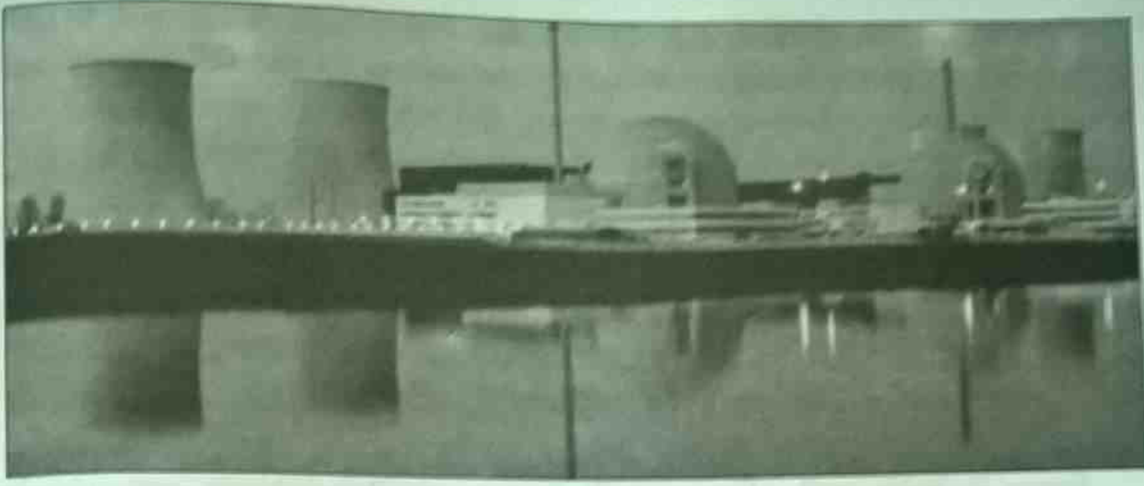
বল পয়েন্ট পেনের রিফিলের মুখ

বাইরে বেরোতে পারত না। যদি রিফিলের পিছনদিকটা খোলা থাকে, অথবা পিছনদিকে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহলে কালি যতই খরচ হোক না কেন, রিফিলের সামনের দিকে ও পিছনের দিকে বায়ুর চাপ সবসময় একই থাকে। এর ফলে কালির প্রবাহ সবসময়েই সহজ হয়।

অনেক সময় কাগজের সঙ্গে বলের ঘর্ষণ বাড়াতে বলের উপরিতলকে পুরোপুরি মসৃণ না রেখে তাতে নকশাদার খাঁজ কাটা হয়। অবশ্য এই নকশাদার খাঁজ খালি চোখে দেখা যায় না। বল পয়েন্ট পেনের বল যত নিখুঁত হয় সেই পেনে তত সহজে সুন্দর লেখা পড়ে। বেশিরভাগ ডট পেনেরই বল নিখুঁত হয় না, আর কালি বেরোনোর ব্যবস্থাও তেমন বাধাহীন নয়। ফলে এই ধরনের পেন দিয়ে লেখার সময় আমাদের যথেষ্ট চাপ দিয়ে লিখতে হয়। সম্প্রতি ইউরোপীয় প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন ধরনের বহু ডটপেন এসেছে ভারতের বাজারে। এই ডট পেনের রিফিলের বল টাংস্টেন কারবাইড দিয়ে তৈরি। এই যৌগটি প্রায় হিরের মতো কঠিন। এই যৌগ দিয়ে বল তৈরি হওয়ার ফলে এই রিফিলে খুব সহজেই সুন্দর লেখা পড়ে।

ঝরনা কলম তৈরির কারিগরিতে অনেকগুলো জটিল ধাপ রয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় ডট পেনের রিফিল তৈরির কাজ অনেক সহজ, আর রিফিলের দামও বেশ কম। এইসব কারণেই ডট পেন এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'নিজস্ব কলম' বলতে অনেকে এখনও ঝরনা কলমই পছন্দ করেন।

বিখ্যাত ফরাসি পেন কোম্পানি 'বি. আই. সি.' দৈনিক এক কোটি বিশ লক্ষেরও বেশি ডট পেন বিক্রি করে। এইরকম এক-একটি ডট পেন দিয়ে গড়ে সাড়ে তিন কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা দাগ টানা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দৈনিক বিক্রি হওয়া ডট পেন দিয়ে চার কোটি বিশ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা দাগ টানা সম্ভব। সুতরাং মোটামুটিভাবে পৌঁনে চার দিন বিক্রি হওয়া ডট পেন দিয়ে যে-দাগ টানা যাবে তার দৈর্ঘ্য পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব হল প্রায় চোদ্দো কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ কিলোমিটার।



পরমাণু-শক্তি

আমরা জানি যে, এই বিশ্বের প্রতিটি পদার্থই পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণু অতি ক্ষুদ্র এক কণা। পরিভাষায় বলতে হলে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্রতম কণাই হল পরমাণু। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, পরমাণু মাপে খুবই ছোট। পরমাণুর কার্যকর ব্যাসার্ধ হল 10^{-10} মিটার—অর্থাৎ, এক মিটারের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ। অথচ এই পরমাণু থেকেই বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন অমিতশক্তি। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এই কণার ভেতরে কী করে সুপ্ত থাকে বিপুল শক্তি? বিজ্ঞানের কোন নীতি কাজে লাগিয়ে ছোট্ট এই পরমাণু থেকে পাওয়া গেল পরমাণু-বোমা?

নানা দেশের নানা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে আমরা জানি পরমাণুর মধ্যে মূলত তিনরকম কণা আছে : ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এর মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন জোট বেঁধে আছে পরমাণুর কেন্দ্রে। এই জোটকে বলে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রমণ করছে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রন কণাকে এককথায় বলা হয় 'নিউক্লিওন'। যেহেতু সব নিউক্লিয়াসই একইরকম কণা দিয়ে তৈরি, বিজ্ঞানীরা তাই স্বাভাবিকভাবেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, একটা নিউক্লিয়াসকে অন্য নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই রূপান্তরের জন্য কোনো নিউক্লিয়াসের প্রোটন বা নিউট্রনের সংখ্যা বাড়ানো দরকার, অথবা, কোনোভাবে সেই নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিওন সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। 1919 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড হাতেনাতে এই ঘটনা ঘটিয়ে একটি মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই পরীক্ষায় রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াসকে দ্রুতগতিসম্পন্ন 'আলফা কণা' দিয়ে আঘাত করে একটি প্রোটনকে মুক্ত করেছিলেন। এর ফলে পাওয়া গিয়েছিল অক্সিজেনের একটি 'আইসোটোপ' অক্সিজেন-17।

কিন্তু কাকে বলে আলফা কণা? আর তাকে দ্রুতগতিতে নিয়ে যাওয়ার কারণটিই বা কী?

আলফা কণা হল হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস, যার মধ্যে রয়েছে দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন। কোনো-কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ধনাত্মক আলফা কণা বিকিরিত হয়। এই আলফা কণাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন না করে রাদারফোর্ড তাঁর পরীক্ষায় ব্যবহার করতে পারেননি। এর কারণ, কোনো পদার্থের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওনগুলো পরস্পরের সঙ্গে তীব্র আকর্ষণ-বলে যুক্ত থাকে। এই বলের কার্যকারিতা মাত্র 10^{-15} মিটার দূরত্ব পর্যন্ত। সুতরাং, নিউক্লিয়াস থেকে একটি প্রোটনকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলফা কণা প্রয়োজন। অর্থাৎ, তার গতিশক্তি খুব বেশি হওয়া দরকার।

এই ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় নিউক্লীয় বিক্রিয়া। আর যে-যন্ত্রের সাহায্যে এই বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে বলে কণা-ত্বরণযন্ত্র বা 'পার্টিক্‌ল অ্যাকসিলারেটর'। এর চলতি নাম হল 'অ্যাটম স্ম্যাশার'।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতই এগিয়েছে ততই উন্নত মানের উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা-ত্বরণযন্ত্র তৈরি হয়েছে। ফলে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা এগিয়ে গেছে দ্রুতগতিতে। এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে 'সাইক্লোট্রন', 'ভ্যান দ্য গ্রাফ অ্যাক্‌সিলারেটর' ইত্যাদি। এইরকম নিউক্লীয় বিক্রিয়া থেকেই পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত পরমাণু-শক্তি।

শুধু যে নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন বা নিউট্রন মুক্ত করতে পারলেই পরমাণু-শক্তি পাওয়া যায় তা নয়। কোনো মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন বা প্রোটন যুক্ত করতে পারলেও পরমাণু-শক্তি পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'ফিশন' বা 'বিভাজন'। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির নাম 'ফিউশন' বা 'সংযোজন'। উন্নয়ন ও সামরিক ব্যবহারের জন্য যে-বিপুল পরিমাণ পরমাণু-শক্তি উৎপন্ন হয় তার সবটাই এই দুই ধরনের বিক্রিয়া থেকে পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে পরমাণু-শক্তি তৈরি হচ্ছে সবসময়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের তাপ এবং আলোর মূল উৎসই হল নিউক্লীয় বিক্রিয়া। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন নিউক্লীয় শক্তি পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপের জন্য প্রধানভাবে দায়ী। 1930 সালে প্রথম অ্যাটম স্ম্যাশার তৈরি হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা অল্প পরিমাণে পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের রহস্য জেনেছিলেন। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এই শক্তি কী করে উৎপাদন করা যায় তা জানা গিয়েছিল 1942-এর ডিসেম্বর মাসে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তারপর, সেই জ্ঞানের ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞানীরা একে-একে তৈরি করেছেন নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, নিউক্লীয় শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ, যুদ্ধজাহাজ, পরমাণু-বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি। নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের শক্তি পাওয়া যায় বিভাজন বিক্রিয়া থেকে। আর হাইড্রোজেন বোমা তার বিধ্বংসী শক্তি পায় সংযোজন বিক্রিয়া থেকে। সুতরাং বিভাজন অথবা সংযোজন বিক্রিয়া থেকে যে-অমিতশক্তি পাওয়া যায় তাকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যবহার করে ভালো কাজে যেমন লাগানো যায়, তেমনই লাগানো যায় অশুভ কাজে। এসব কাজে

অংশ নেন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের দল। তাঁদের ওপরেই নির্ভর করে পরমাণু-শক্তির শুভ কিংবা অশুভ প্রয়োগ। ফিশন বা ফিউশনকে এর জন্য কখনোই দায়ী করা যায় না।

প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা সঠিক অনুপাতে থাকলে তবেই কোনো নিউক্লিয়াসকে সুস্থিত বলা যায়। এ ধরনের নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয়তা থাকে না। যদি কোনো কারণে নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়, তাহলে আরও সুস্থিত অবস্থায় যাওয়ার জন্য সেই নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন কণা বিকিরণ করে। এর ফলে নিউট্রন কণা প্রোটন কণায় রূপান্তরিত হয়।

আবার যদি প্রোটনের সংখ্যা খুব বেশি থাকে, তাহলে পজিট্রন কণা বিকিরণ করে সেই নিউক্লিয়াস আরও সুস্থিত অবস্থায় পৌঁছে যায়। এর ফলে বাড়তি প্রোটন রূপান্তরিত হয় নিউট্রনে। বোঝাই যাচ্ছে, পজিট্রন কণা হল ধনাত্মক ইলেকট্রন কণা। এই কণা বিকিরণ করেই ধনাত্মক প্রোটন তড়িৎহীন নিউট্রনে বদলে যায়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভারী মৌলিক পদার্থ বিভাজন বিক্রিয়ার পক্ষে সুবিধেজনক —বিশেষ করে যেসব মৌলিক পদার্থ সীসের তুলনায় ভারী। কিন্তু বিভাজন বিক্রিয়া ঘটাতে গেলে যথেষ্ট শক্তি দরকার। এই শক্তি জোগায় কণা-ত্বরণযন্ত্র থেকে নির্গত উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা, অথবা 'গামা রশ্মি'র শোষণ। গামা রশ্মি হল এক্স-রশ্মির চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ।

দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে বিভাজন বিক্রিয়া শুরু করে এমন সব ভারী নিউক্লিয়াসই হল পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ জ্বালানি। এদের বলা হয় 'ফিশনেব্‌ল মেটিরিয়াল্‌স' বা 'বিভাজনযোগ্য পদার্থ'। এ ধরনের পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হল ইউরেনিয়াম-235 আর প্লুটোনিয়াম-239।

পিচব্লেন্ড আকরিক থেকে পাওয়া ইউরেনিয়াম-235-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে তার নিউক্লিয়াস মোটামুটি সমান ওজনের দুটো টুকরোয় ভেঙে যায়। এই বিক্রিয়ায় দু-তিনটে নিউট্রনও মুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন, ইউরেনিয়াম-235-এর নিউক্লিয়াসকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে মলিব্‌ডেনাম-105, টিন-128 ও তিনটে নিউট্রন মুক্ত হয়। এ ছাড়াও নানাভাবে বিভাজন বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইউরেনিয়াম-235-কে অন্য পদার্থে ভাঙা যায়। এরকম একটা ভারী নিউক্লিয়াস যখন একাধিক টুকরোয় ভেঙে যায় তখন টুকরোগুলোকে বলা হয় 'ফিশন ফ্র্যাগমেন্ট্‌স' বা 'বিভাজিত টুকরো'। এই টুকরোগুলো মোটেই সুস্থিত নয়, কারণ, এদের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা থাকে বেশি। এইসব বিভাজিত টুকরো তেজস্ক্রিয় হয়। তখন এই নিউক্লিয়াসগুলো বারবার ইলেকট্রন মুক্ত করে অতিরিক্ত নিউট্রনকে প্রোটনে পরিণত করে। এই ঘটনাকে বলা হয় 'বিটা ডিকে' বা 'বিটা কণা ক্ষয়'। কোনো তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস যখন ইলেকট্রন বা পজিট্রন কণা মুক্ত করে তখন সেই ঘটনাকে সাধারণভাবে বিটা কণা ক্ষয় বলা হয়।



প্রেশারাইজ্‌ড ওয়াটার রিয়্যাক্টর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

এইভাবে যখনই নিউট্রন প্রোটনে বদলে যায় তখনই ভিন্ন কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়াসটি রূপান্তরিত হয়। যেমন, আগের উদাহরণের টিন–128 ক্রমাগত রূপবদল করে শেষ পর্যন্ত সুস্থিত টেলুরিয়াম–128–এ পরিণত হয়।

অনেক সময়েই বিভাজিত টুকরোগুলো দীর্ঘ সময় ধরে তাদের তেজস্ক্রিয় ধর্ম বজায় রাখে। ফলে এদের নিরাপদ বর্জন ব্যবস্থা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বেশিমাত্রায় নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদন করতে গেলে এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধানের কথা আগে ভাবা দরকার। এসব তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ নানান শিল্প ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে লাগে।

একজোড়া অণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে–শক্তি উৎপন্ন হয়, একটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে তার তুলনায় 20 থেকে 200 মিলিয়ন গুণ শক্তি উৎপন্ন হয়। নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় পদার্থ রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। এই রূপান্তরের মূল সূত্র হল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$। এই সমীকরণে E হচ্ছে উৎপন্ন শক্তি, m হল গতিহীন অবস্থায় পদার্থের ভর, আর c হল আলোর গতিবেগ। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, খুব অল্প পরিমাণ পদার্থ থেকে বিপুল শক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন, এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম–235 যখন

বিভাজিত হয়, তখন বিভাজিত টুকরোগুলো ও মুক্ত নিউট্রনের মোট ভর হয় 0.999 পাউন্ড। অতএব, বাকি 0.001 পাউন্ড পদার্থ রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। এই শক্তি 30 মিলিয়ন মিলিয়ন ফুট-পাউন্ড যান্ত্রিক শক্তির সমান, অথবা 11 মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তির সমতুল। 1500 টন কয়লা কিংবা দু-লক্ষ গ্যালন গ্যাসোলিন পোড়ালেও এই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

ইউরেনিয়াম-235-এর ফিশনের ফলে যে-দু-তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয় সেগুলো আবার ফিশন ঘটাতে পারে এবং প্রতিটি ফিশনের জন্য আবার পাওয়া যাবে দুটি কি তিনটি করে নিউট্রন। এই ধরনের ধারাবাহিক বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'চেইন রিয়্যাকশন' বা 'শৃঙ্খল বিক্রিয়া'। এই শৃঙ্খল বিক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয় অসীম শক্তি। নানা ধরনের পরমাণু চুল্লি এই শৃঙ্খল বিক্রিয়া ঘটিয়ে নিউক্লীয় শক্তির জোগান দেয়। ফলে এরাই নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের প্রাণ।

জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান নিউক্লীয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন তিরিশ দশকের শেষে এবং 1939 সালে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কারের জন্য 1944 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অটো হান। হান ছাড়াও বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সেসময়ে একই গবেষণায় মন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন এনরিকো ফের্মি, লিও জিলার্ড, আইরিন ও ফ্রেডেরিক জোলিও কুরি, লিজ মাইটনার। এইসব বিজ্ঞানীর গবেষণায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কারণ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শৃঙ্খল বিক্রিয়া থেকে যে অসীম শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তৈরি করা যেতে পারে বিধ্বংসী পরমাণু-বোমা, সেটা আইনস্টাইন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি দিয়ে তিনি পরমাণু-বোমা তৈরির গবেষণায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জার্মানি যদি সবার আগে পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলে তাহলে হিটলার হয়তো শুরু করে দেবেন মারাত্মক ধ্বংসলীলা—এটাই ছিল আইস্টাইনের আশঙ্কা। আমেরিকা পরমাণু-বোমা তৈরির দৌড়ে প্রথম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পরেই ঘটে গিয়েছিল হিরোশিমা-নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনার জন্য আইনস্টাইন মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর ওই ছোট্ট একটি চিঠি অনেক বড় সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

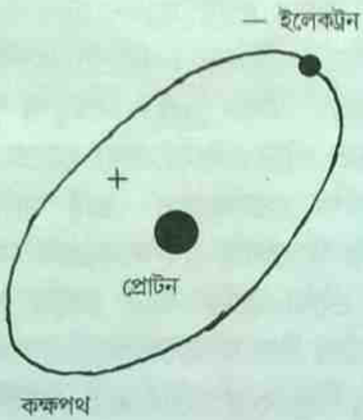
এইভাবেই শৃঙ্খল বিক্রিয়ার পরিণামে দুনিয়া জুড়ে ঘটে গিয়েছিল মারাত্মক বিশৃঙ্খল অবস্থা।

দুর্লভ ভারী মৌলের বিভাজন বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপন্ন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ পরমাণু-শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করছে। কিন্তু সেই তুলনায় সংযোজন বিক্রিয়াকে মোটেই কাজে লাগানো যায়নি। অথচ হালকা মৌলের সংযোজন বিক্রিয়ায় অনেক সুবিধে পাওয়া যায়। বিশেষ করে হাইড্রোজেনের বেলায় তো বটেই! এই বিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিউক্লীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এখনও

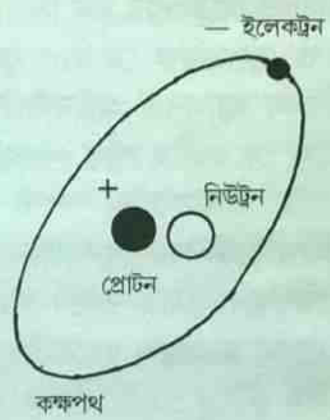
পর্যন্ত উপকার হতে পারে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজে ব্যবহার করা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীরা 'জয়েন্ট ইওরোপিয়ান টরাস' (সংক্ষেপে 'জেট') নামে একটি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর তৈরি করেছেন। 1991 সালে এই রিয়্যাক্টরে নিয়ন্ত্রিত সংযোজন বিক্রিয়া ঘটানোর প্রথম পদক্ষেপ তাঁরা নিয়েছেন। এ থেকে তাঁরা 40 কিলোওয়াট সংযোজন-শক্তি পেয়েছিলেন।

সংযোজন বিক্রিয়ার সমস্যা হল, ব্যবহারিক কাজের পক্ষে উপযোগী হারে এই বিক্রিয়া ঘটাতে হলে 350 মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা প্রয়োজন। অতি সামান্য জ্বালানি ব্যবহার করলেও এই উষ্ণতা অতি উচ্চচাপ সৃষ্টি করে এবং বিপজ্জনক হারে শক্তি বিকিরণ করতে থাকে। কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনো পাত্রকে কিছুতেই এই বিক্রিয়াজাত গ্যাসের সংস্পর্শে নিয়ে আসা যাবে না। কারণ, আমাদের জানা সব ধাতু এই উষ্ণতায় গলে যায়। সেইজন্যই বিজ্ঞানীরা চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে এই গ্যাসকে বন্দি করতে চেষ্টা করছেন।

সংযোজন বিক্রিয়ার সুবিধেজনক জ্বালানি হল হাইড্রোজেনের ভারী আইসোটোপ 'ডিউটারিয়াম'। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর তফাত শুধু নিউক্লিয়াসের গঠনে। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন কণা আছে। আর ডিউটারিয়ামের নিউক্লিয়াসে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন।



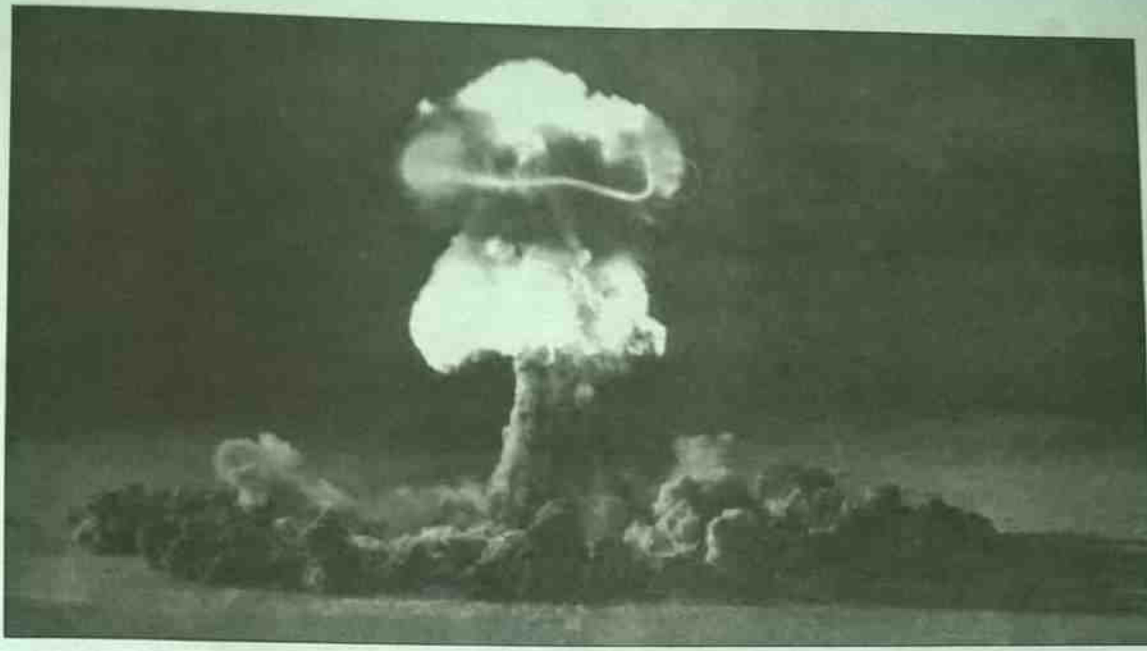
হাইড্রোজেন পরমাণু



ডিউটারিয়াম পরমাণু

ডিউটারিয়ামের সংযোজন বিক্রিয়ায় এর নিউক্লিয়াস শেষ পর্যন্ত সুস্থিত হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অবিরাম এই বিক্রিয়াই চলেছে। গড়ে 7000টি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ডিউটারিয়াম পরমাণু পাওয়া যায়। এক গ্যালন সাধারণ জলে যে-পরিমাণ ডিউটারিয়াম থাকে, তা থেকে 350 গ্যালন গ্যাসোলিন দহনের সমপরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলে যে-পরিমাণ ডিউটারিয়াম আছে তা দিয়ে সারা পৃথিবীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো যাবে কমপক্ষে 10 বিলিয়ন বছর!

ডিউটারিয়াম ছাড়াও হাইড্রোজেনের আর-একটি আইসোটোপ রয়েছে। তার নাম 'ট্রিটিয়াম'।



বিকিনি দ্বীপে পরমাণু-বোমার প্রথম পরীক্ষা

এই আইসোটোপটিও সংযোজন বিক্রিয়ায় কাজে লাগানো যায়। যেমন, 'জেট' রিয়্যাক্টরে জ্বালানি হিসেবে ট্রিটিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল।

সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ তেজস্ক্রিয় নয়। ফলে বিভাজন বিক্রিয়ার মতো বর্জ্য পদার্থ অপসারণের সমস্যা এ ক্ষেত্রে নেই। যেমন, হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ থাকে অতি সামান্য। হাইড্রোজেন বোমায় সংযোজন বিক্রিয়া শুরুর জন্য ফিশন বিস্ফোরণের দরকার হয়। এ থেকে যেটুকু তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেটুকুই বলতে গেলে হাইড্রোজেন বোমার মোট নিউক্লীয় বর্জ্য পদার্থ।

সংযোজন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেক। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নিউক্লীয় শক্তিকে যদি ভালো কাজে লাগানো যায় তাহলে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে নিউক্লীয় শক্তির ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে উঠবে। যেমন, হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে খুব সামান্য তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। ফলে এই বোমার সাহায্যে ছোটোখাটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খননের কাজ বা নগরায়ণের কাজ নিরাপদে করা যেতে পারে।

নিউক্লীয় বিক্রিয়া আমাদের অফুরান শক্তি জোগানোর চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠিকে মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করাটাই হবে মানুষের মতো কাজ। তাহলেই আগামীদিনের মানুষ আমাদের মনে রাখবে।



নিওন সাইন

পৃথিবীর যে-কোনো বড় শহরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালেই চোখে পড়ে 'নিওন সাইন'। লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙিন আলোর রেখায় আঁকা। কত ছবি, কত কথা! রাতের অন্ধকারে 'নিওন সাইন'-এর বিজ্ঞাপন আলোর মেলা সাজিয়ে হাতছানি দেয় আমাদের। অথচ রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী 'নিওন' একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা প্রথম বলেছিলেন ডেনমার্কের রসায়নবিজ্ঞানী হান্স পিটার টমসেন। এরপর স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম র্যামজি নানান নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার করেন।

1910 সাল নাগাদ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে ফরাসি রসায়নবিজ্ঞানী জর্জেস ক্লদ লক্ষ করেন, এইসব গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-মোক্ষণ ঘটালে আলো দেখা যায়। নিওন গ্যাস নিয়ে এই পরীক্ষা করে ক্লদ উজ্জ্বল লালচে-কমলা আলো পেয়েছিলেন। এইভাবেই 'নিওন লাইট' বা 'নিওন সাইন'-এর শুরু হয়েছিল।

সরু কাচের নলের মধ্যে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরে অতি সহজেই সেই নলকে বাঁকিয়ে কোনো ছবি বা বর্ণের আকার দেওয়া যায়। অথচ সেই সময়ে প্রচলিত 'ইনক্যানডিসেন্ট

ল্যাম্প' বা সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্‌ব থেকে এরকম সুবিধে পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে 'নিওন সাইন' খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে রাস্তার দুপাশের বিজ্ঞাপনে 'নিওন সাইন' হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য। আজও তার সেই জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি।

কিন্তু 'নিওন সাইন' কীভাবে কাজ করে?

তার মূল নীতি হল, নিওন গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-মোক্ষণ। সাধারণ অবস্থায় নিওন গ্যাস বিদ্যুতের কুপরিবাহী। কিন্তু তার চাপ যদি খুব কমিয়ে দেওয়া যায়, আর একইসঙ্গে খুব বেশি মাত্রার ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যায়, তাহলে নিওন গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে ওঠে।

একটি কাচনলে খুব কম চাপে নিওন গ্যাস ভরে নলের দু-প্রান্তের দুটি তড়িৎদ্বারে উঁচুমানের ভোল্টেজ প্রয়োগ করে জর্জেস ক্লদ সফল হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নিওন গ্যাসের চোখধাঁধানো লাল-কমলা আলো।

নিওন গ্যাস ভরা নলের দু-প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে নলের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে থাকে। চলার পথে এই ইলেকট্রন কণার সঙ্গে নিওন পরমাণুর সংঘর্ষ হয়। ফলে নিওন পরমাণুর কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন কণা মুক্ত হয়ে পড়ে। মুক্ত ইলেকট্রন কণাগুলো সংঘর্ষের ফলে বাড়তি শক্তি পায়—অনেকটা ঠোক্কর খাওয়া বিলিয়ার্ড বলের বাড়তি গতির মতো।

মুক্ত ইলেকট্রন কণাগুলো যখন আবার কক্ষপথে ফিরে আসে, তখন তারা বাড়তি শক্তিটুকু তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ হিসেবে ছেড়ে দেয়। এই বিকিরণের কম্পাঙ্ক এমন যে, তা আমরা উজ্জ্বল লাল-কমলা আলোর চেহারায় দেখতে পাই।

কাচনলের মধ্যে অন্যান্য গ্যাস রেখে তড়িৎ-মোক্ষণ ঘটালে ভিন্ন-ভিন্ন রঙের আলো পাওয়া যায়। তার কারণ, এক-একটি গ্যাসের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের কম্পাঙ্ক এক-একরকম। যেমন, হিলিয়াম গ্যাস থেকে সোনালি-হলুদ আলো পাওয়া যায়। আবার ক্রিপ্টন গ্যাস দেয় ফিকে বেগুনি আলো। এ ছাড়া অন্যান্য রং পেতে হলে কাচনলের ভেতরে বিশেষ ধরনের প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ দিতে হয়, আর নলের ভেতরে আরগন গ্যাস ও পারদ বাষ্প ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের গ্যাস-বাতি থেকে নানা রঙের বর্ণমালা পেতে আর কোনো অসুবিধে নেই।

যেহেতু এধরনের আলোয় নিওন ছাড়া অন্যান্য গ্যাসও ব্যবহার করা হয়, সেহেতু সঠিকভাবে একে 'নিওন সাইন' না বলে 'গ্লো সাইন' বলাটাই ভালো। কিন্তু নিওন গ্যাস দিয়ে সবকিছুর শুরু হয়েছিল বলেই আমরা চলতি কথায় এ ধরনের আলোকে 'নিওন সাইন' বলে থাকি।



ক্রিকেট-বলের সুইং ও রিভার্স সুইং

ক্রিকেট খেলার কথা বললেই মনে পড়ে যায় পেস বোলারদের কথা। লারউড, বেডসার, লিন্ডওয়াল থেকে শুরু করে গ্লেন ম্যাকগ্রা, ব্রেট লি, চামিন্ডা ব্যাস, শোয়েব আখতার, ইরফান পাঠান—সকলেরই মারাত্মক অস্ত্র সুইং বল। এঁদের কেউ আউটসুইং বলে দক্ষ, আবার কেউ বা ইনসুইং বল করতে ওস্তাদ।

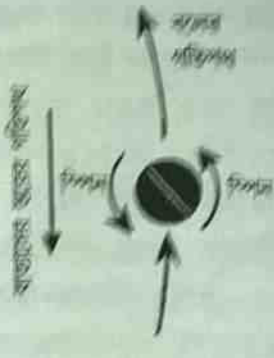
সুইং বল প্রধানত দুরকমের হলেও তার আবার একটু-আধটু রকমফেরও আছে। যেমন, লেট-ইনসুইং বা লেট-আউটসুইং। তা ছাড়া বলের আকৃতি, মসৃণতা, ভারী আবহাওয়া, বাতাসের গতি বা ধরন, এসবের ওপরে নির্ভর করেও সুইং বলের নানান হেরফের ঘটে। সুতরাং পরিশ্রম, দক্ষতা আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে পেস বোলাররা নানারকমের সুইং বল করতে পারেন।

কিন্তু সুইং বলের মূল নীতি কি? কী করে সুইং করে ক্রিকেট-বল?

সুইং শুধু ক্রিকেট-বলের ব্যাপার নয়। লন-টেনিস, টেবল-টেনিস কিংবা ফুটবল খেলার সময়েও সুইং দেখা যায়। অর্থাৎ, বাতাসে ভেসে যাওয়ার সময় যে-সাধারণ গতিপথ ধরে বলটার যাওয়ার কথা তা না গিয়ে বলটা একটু অস্বাভাবিক বাঁক নেয়। ফলে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের বুঝতে অসুবিধে হয় বলটা ঠিক কোন্ পথ ধরে ভেসে আসবে।

লন-টেনিস, টেবল-টেনিস বা ফুটবল খেলার সময় সুইং-এর কারণ হল বলের স্পিন। এই স্পিনের জন্যই স্টেফি গ্রাফের টপস্পিন ফোরহ্যান্ড শট নেট পার হয়ে তীব্র বাঁক নিয়ে মাটির দিকে চট করে নেমে যায়, আর ডেভিড বেকহ্যাম কিংবা রোনাল্ডিনহোর ফ্রি কিক বাতাসে বাঁক নিয়ে বিপক্ষের গোলকিপারকে বিভ্রান্ত করে। স্টেফি গ্রাফের শটের বেলায়

টেনিস-বলটি অনুভূমিক অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘোরে, আর বেকহ্যামদের কুশলী ফ্রি কিক শটের ফলে ফুটবলটা ঘুরতে থাকে উল্লম্ব অক্ষকে কেন্দ্র করে। তবে দু-ক্ষেত্রেই স্পিনের ফলে বলের দুপাশে বাতাসের আপেক্ষিক গতিবেগ দুরকম হয়। অর্থাৎ, স্পিনের জন্য বলের একদিকের বাতাসের সরণ হয় বলের গতিপথের দিকে বা সামনের দিকে, আর অন্যদিকের সরণ হয় বলের গতিপথের ঠিক বিপরীতদিকে বা পিছনদিকে। এই কারণেই, বলের যে-দিকটা পিছনদিকে যায় তার লাগোয়া বাতাসের স্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ হয় বেশি। আর অন্যদিকে বাতাসের স্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ হয় কম।



স্পিনিং বলের সুইং

প্রবাহী গতিবিদ্যা বা ফ্লুইড মেকানিক্সের মৌলিক সূত্র হল 'বারনুলির নীতি'। 1738 সালে সুইস গণিতজ্ঞ ড্যানিয়েল বারনুলি এই নীতির কথা জানিয়েছিলেন। এই নীতির মূল কথা হল, কোনো তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের প্রবাহের গতিবেগ যত বাড়বে, পারিপার্শ্বিকের ওপরে সে ততই কম চাপ প্রয়োগ করবে। ফলে কোনো টেনিস-বল বা ফুটবল যদি স্পিন করে তবে বারনুলির নীতি অনুসারে তার দুপাশে বাতাসের চাপের তফাত হবে এবং এই অসম চাপ বলটাকে একপাশে ঠেলে দেবে। স্পিনিং বলের যে-দিকে বাতাসের স্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ বেশি, বলটা সেদিকেই সরে যাবে।

কোনো-কোনো স্পিন বোলার ধীরে বল করলেও ফ্লাইটেড ডেলিভারিকে তাঁরা এইভাবে সুইং করাতে পারেন। কিন্তু ম্যাকগ্রা, ব্রেট লি বা শোয়েব আখতার মোটেও এভাবে বল সুইং করান না। অর্থাৎ, পেস বোলারদের বল সুইং করে অন্য কারণে। তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও বাতাসে ছুটে যাওয়া বলের দুপাশে চাপের তফাত দরকার। এই চাপের তফাত তৈরির চাবিকাঠি হল ডিউস বলের সেলাই বা সিম।

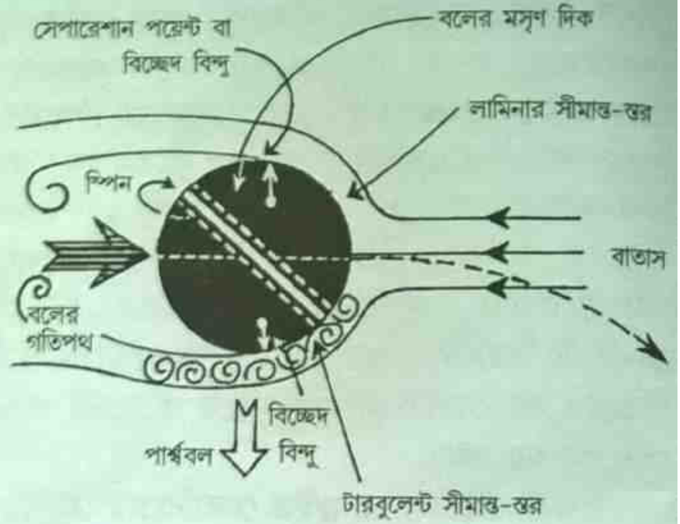
ডিউস বল যখন বাতাস কেটে ছুটে যায়, তখন তাকে ঘিরে থাকা বাতাসের স্তর প্রবাহিত হয় বিপরীত দিকে। বাতাসের এই স্তরকে বলা হয় 'বাউন্ডারি লেয়ার' বা সীমান্ত-স্তর। সীমান্ত-স্তরের ওপরে সিমের ক্রিয়া কীরকম হয় তার ওপরেই নির্ভর করে সুইং বলের ধরন।

ডিউস বল যখন ছুটে যায় তখন খুব পাতলা একটা বায়ুস্তর বলটাকে ঘিরে থাকে। বলের সঙ্গে-সঙ্গেই চলতে থাকে এই বায়ুস্তর। কিন্তু বল থেকে খানিকটা দূরের বাতাস বলের গতির জন্য একটুও প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ, বলের গায়ে লেগে থাকা বাতাসের স্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ শূন্য, আর বল থেকে খানিকটা দূরের অবিচলিত বায়ুস্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ বলের গতিবেগের সমান। এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চল হল সীমান্ত-স্তর। এই স্তরের বেধ সাধারণত পাঁচ মিলিমিটারেরও কম।

সিমের সঙ্গে সীমান্ত-স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনো পেস বোলার

তাঁর সুইং-এর ধরন বদলাতে পারেন।

বলের গা দিয়ে সীমান্ত-স্তর যখন বয়ে যায়, তখন বলের ওপরে এই স্তরের চাপ ক্রমাগত পালটায়। বলের সামনের দিকে স্তরের আপেক্ষিক গতিবেগ থাকে কম, ফলে সে চাপ দেয় বেশি। সীমান্ত-স্তর বলের গা বেয়ে যতই পিছনদিকে যায় ততই তার গতিবেগ বাড়তে থাকে। বলের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে সীমান্ত-স্তরের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি হয়—অর্থাৎ, সে তখন চাপ দেয় সবচেয় কম। তারপরই এই স্তরের গতিবেগ কমতে থাকে। আসলে হয় কী, একটা জায়গায় পৌঁছে সীমান্ত-স্তর বলের গা থেকে ছেড়ে যায়। এই বিন্দুকে বলে 'বিচ্ছেদ বিন্দু'। বিচ্ছেদ বিন্দুর পরবর্তী অঞ্চলে যেসব বায়ুস্তর বলকে ঘিরে থাকে তাদের চাপ মোটামুটি সমান।



সাধারণত পেস বোলাররা যেভাবে বল সুইং (ইনসুইং) করিয়ে থাকেন (ওপর থেকে দেখলে যেমন দেখাবে)

তবে অনেক সময় বলের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছনোর আগেই সীমান্ত-স্তর বলের গা থেকে ছেড়ে যেতে পারে। আবার মাঝামাঝি অঞ্চল পেরিয়েও সীমান্ত-স্তর বিদায় নিতে পারে। তবে প্রথম ক্ষেত্রে বলের মাঝামাঝি অঞ্চলে যে-চাপ হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই চাপের মান হবে তুলনায় কম। সুতরাং, যদি এমন ঘটনা ঘটে যাতে বলের একদিকে সীমান্ত-স্তর মাঝামাঝি অঞ্চল পেরিয়ে তারপর বলের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, আর অন্যদিকে মাঝামাঝি অংশে পৌঁছনোর আগেই বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে বলটির দুপাশের চাপ হবে দুরকম। ফলে চাপের পার্থক্যজনিত বল ডিউস বলটিকে কম চাপের দিকে ঠেলে দেবে। অর্থাৎ, সহজ কথায় বলতে গেলে, সীমান্ত-স্তর যদি বলের দুপাশ থেকে সুসমঞ্জসভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে ডিউস বলটি কোনো দিকে বাঁক না নিয়ে সোজা পথে ভেসে যাবে। আর যদি সীমান্ত-স্তর সামঞ্জস্যহীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে বলটি সুইং করবে।

সীমান্ত-স্তর আবার দুরকমের হতে পারে : 'লামিনার' অথবা 'টারবুলেন্ট'। লামিনার সীমান্ত-স্তরের ক্ষেত্রে বাতাসের প্রতিটি স্তর মসৃণ সুষমভাবে বয়ে যায়। আর টারবুলেন্ট সীমান্ত-স্তরের বেলায় বায়ুস্তর বয়ে যায় এলোমেলোভাবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, টারবুলেন্ট স্তর লামিনার স্তরের তুলনায় বেশিক্ষণ বলের গা আঁকড়ে থাকে। সুতরাং বলের দু-দিকে যদি দুরকম সীমান্ত-স্তর তৈরি করা যায়, তাহলে বলের দুপাশে সীমান্ত-স্তর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে

মোটেই সামঞ্জস্য থাকবে না। ফলে লামিনার স্তরের দিকে বায়ুচাপ হবে বেশি, আর টারবুলেন্ট স্তরের দিকে বায়ুচাপের মান হবে কম। সাধারণত সুইং বোলাররা এইভাবেই ক্রিকেট-বলকে বাতাসে সুইং করিয়ে থাকেন।



ব্যাকস্পিন—পাশ থেকে দেখলে যেমন দেখাবে

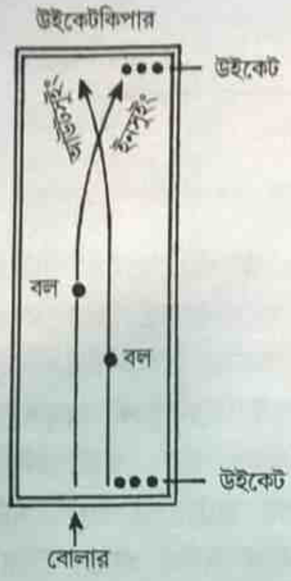
বল করার সময় পেস বোলাররা বলের সিম এমনভাবে রাখেন যাতে বলের গতিপথের সঙ্গে সিম সামান্য কোণ করে থাকে। তা ছাড়া বলের অপেক্ষাকৃত চকচকে ও মসৃণ দিকটা তাঁরা সামনের দিকে রাখেন। এই দিকের সীমান্ত-স্তরে লামিনার প্রবাহ হয়। কিন্তু যেসব বায়ুস্তর বলের অন্যদিকে যায়, তারা সিমে আঘাত পাওয়ামাত্রই টারবুলেন্ট অবস্থায় চলে যায়। ফলে মসৃণ দিকের সীমান্ত-স্তর বল থেকে আগে বিচ্ছিন্ন হয়। আর বলটা টারবুলেন্ট সীমান্ত-স্তরের দিকে সুইং করে যায়। বলের দুপাশে চাপের তফাতের জন্য মোট যে-পার্শ্ববল বলের ওপরে পড়ে, তার মান বলের ওজনের অর্ধেক পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ, এর মান প্রায় 0.8 নিউটন হতে পারে। এর ফলে ডিউস বলটি বোলারের হাত থে কে যখন ব্যাটসম্যানের কাছে গিয়ে পৌঁছয়, তখন সুইং-এর জন্য সেটা প্রায় দু-ফুট পাশে সরে যেতে পারে। তবে বলের সামনের দিকটা অবশ্যই মসৃণ হতে হবে। তা না হলে লামিনার সীমান্ত-স্তর তৈরি হবে না, আর বলও সুইং করবে না। সেইজন্যেই পেস বোলাররা সবসময় বলের একটা দিক প্যান্টে ঘষে সেটাকে চকচকে মসৃণ রাখার চেষ্টা করেন।

বল ইনসুইং না আউটসুইং হবে সেটা নির্ভর করছে টারবুলেন্ট সীমান্ত-স্তর বলের কোন্‌দিকে তৈরি হচ্ছে তার ওপর। সুতরাং বলের গতিপথের সঙ্গে সিমের কোণ পালটালেই টারবুলেন্ট সীমান্ত-স্তরের দিক পালটে যায়। সেইজন্যেই আউটসুইং বল করার সময় সিম থাকে মোটামুটিভাবে ফার্স্ট স্লিপ অঞ্চলের দিকে মুখ করে। আর বোলার যদি ইনসুইং বল করতে চান তাহলে সিম থাকে লেগ স্লিপ বরাবর। তবে সুইং বলের মূল কথা হল গতিবেগ। কারণ, বল ও বাতাসের আপেক্ষিক গতিবেগ বেশি না হলে টারবুলেন্ট না লামিনার—কোনো সীমান্ত-স্তরই ঠিকমতো তৈরি হবে না।

কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা গেছে, জোরে বল করা সত্ত্বেও কোনো পেস বোলার ঠিকমতো বল সুইং করাতে পারছেন না। এর কারণ হল, বলের গতিবেগ জোরালো হলেও বোলার সীমান্ত-স্তরের শর্ত পূরণ করতে পারেননি। সত্যি কথা বলতে কী, উঁচু মানের পেস বোলার হতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হল বলের লাইন বা লেংথ—আর তার সঙ্গে সুইং-এর ওপরে নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং, বল সুইং করানো নেহাত সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু কী-কী কারণে বল ঠিকমতো সুইং করতে চায় না?

প্রথম কারণ হল বলের 'ব্যাকস্পিন'। পেস বোলার যখন বল ডেলিভারি করেন তখন বলের ওপরে আঙুলের পিছুটানের জন্য ব্যাকস্পিন তৈরি হয়। অর্থাৎ, হাত থেকে ছেড়ে



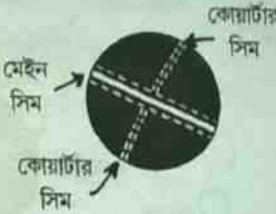
আউটসুইং ও ইনসুইং বলের গতিপথ

দেওয়া বলটি অনুভূমিক অক্ষকে কেন্দ্র করে পিছনদিকে ঘুরতে থাকে। এর ফলে যে-আবর্তন ভরবেগের সৃষ্টি হয় তা বলের গতিপথকে সুস্থিত করে সুইং-এর প্রবণতাকে বাধা দেয়। সেই কারণেই নিখুঁত সুইং পেতে হলে এই ব্যাকস্পিনকে সবসময় বলের সিম বরাবর রাখতে হয়। তাহলে আর টারবুলেন্ট ও লামিনার সীমান্ত-স্তর তৈরির পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না, আর সুইং পাওয়া যায় চাহিদা মতো। কিন্তু বলের গতিপথের সঙ্গে যখন সিম সামান্য কোণ করে রয়েছে, সেই অবস্থায় ডেলিভারির সময় ব্যাকস্পিনকে সিম বরাবর রাখা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। মূলত এই কারণেই সুইং বোলিং-এর কাজটা খুব সহজ নয়।

আউটসুইং বল ব্যাটসম্যানকে লক্ষ করে ছোড়া হলে তা অফস্টাম্পের বাইরের দিকে বাঁক নিয়ে চলে যায়। আর ইনসুইং বলের বাঁক নেওয়ার ধরন ঠিক উলটো। এই ধরনের সুইং বল বাতাসে ভেসে যাওয়ার সময় অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে লেগ স্টাম্পের দিকে বেঁকে যায়। এই দুরকম সুইং বলের গ্রিপ আলাদা, আর বোলিং অ্যাকশনও আলাদা। তা ছাড়া ব্যাকস্পিনের সমস্যাও আছে। এইসব কারণেই খুব কম পেস বোলার আউটসুইং ও ইনসুইং—এই দু-ধরনের বল—সমান দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন। এর ফলে ব্যাটসমান খানিকটা সুবিধে পেয়ে যান। তাঁরা স্রেফ প্রচার মাধ্যম থেকেই জানতে পারেন একজন পেস বোলার কোন ধরনের সুইং বলের জন্য খ্যাতিমান। আর যদি কোনো বোলার দুরকম সুইং বল করেন, তাহলে তাঁর গ্রিপ ও বোলিং অ্যাকশন দেখে ব্যাটসম্যান বুঝতে পারেন বল কোন্‌দিকে সুইং করবে। তা ছাড়া এখন তো সব খেলারই ভিডিয়ো রেকর্ডিং পাওয়া যায়। বিপক্ষের বোলারদের কীভাবে খেলতে হবে মনোযোগ দিয়ে ম্যাচ-ভিডিয়ো বারবার দেখলেই ব্যাটসম্যানরা তার সমাধান পেয়ে যান।

আশির দশকের গোড়ায় লন্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজে সুইং বল নিয়ে গবেষণা করা হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়, বল কতটা সুইং করবে তা নির্ভর করে প্রধানত চারটি জিনিসের ওপরে : বলের গতি, বলের গতিপথ ও সিমের মধ্যে কোণের পরিমাণ, ব্যাকস্পিনের মান এবং বলের তলের অবস্থা। এ ছাড়া বায়ুপ্রবাহের ধরনও সুইংকে প্রভাবিত করে। একটা নতুন ডিউস বল নিয়ে ইমপিরিয়াল কলেজের গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বলের গতি ঘণ্টায় 70 মাইল, গতিপথের সঙ্গে সিমের কোণ 20 ডিগ্রি এবং ব্যাকস্পিন সেকেন্ডে 11 পাক হলে পার্শ্ববলের মান সবচেয়ে বেশি হয়, আর বল সুইংও করে সবচেয়ে বেশি। নব্বই দশকের গোড়ায় হ্যাটফিল্ডের ইউনিভার্সিটি অফ হার্টফোর্ডশায়ারের এরোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড্রু লিউইস ও তাঁর সহকারী গবেষকরা সুইং বল নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা

জানিয়েছেন, বলের গতিপথের সঙ্গে সিমের কোণ যতটা সম্ভব বেশি রাখলে সুইং-এর পরিমাণ হবে বেশি। অথচ প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী এই কোণের মান 15-20 ডিগ্রি হওয়া উচিত, যাতে বলের সিম থাকে ফার্স্ট স্লিপ বা লেগ স্লিপ বরাবর।



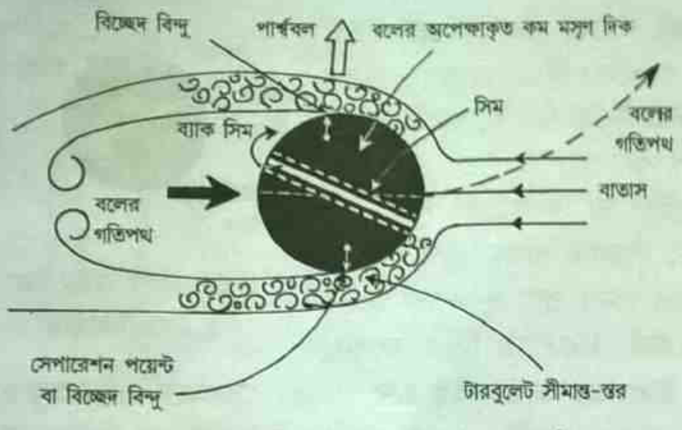
ডিউস বলের মেইন সিম ও কোয়ার্টার সিম

এবারে আসার যাক 'রিভার্স সুইং' বা 'বিপরীত' সুইং-এর কথায়। রিভার্স সুইং-এর ব্যাপারটা সম্ভবত প্রথম লক্ষ করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান খান। প্রায় দু-দশক আগে ইংল্যান্ডের এক ভারতীয় গবেষক রবি মেহতাকে তিনি বলেন, অনেক সময় ইনসুইং করতে গিয়ে তাঁর বল আউটসুইং হয়ে গেছে। সেসময়ে এই 'অদ্ভুত' বিপরীত সুইং-এর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে-ডিউস বল ব্যবহার করা হয় তাতে সরু একটা বাড়তি সেলাই বা সিম থাকে। এই সেলাইটা 'মেইন সিম' বা প্রধান সেলাইয়ের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে থাকে। এই সেলাইকে বলা হয় 'কোয়ার্টার সিম'। এ ধরনের বলে ঘণ্টায় 70 মাইল গতিবেগে বল ছুড়লে সুইং সবচেয়ে বেশি হয়। কিন্তু গতিবেগ বাড়িয়ে 75 মাইল করলে পরে সুইং কমে গিয়ে একেবারে শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, বাতাসে বল আর বাঁক নেবে না। কিন্তু গতিবেগ আরও বাড়িয়ে ঘণ্টায় 85 মাইলের কাছাকাছি নিয়ে গেলে উল্লেখযোগ্য পার্শ্ববল পাওয়া যায়—তবে সেটা হবে প্রথাগত পার্শ্ববলের বিপরীত দিকে। ফলে তখন বলে রিভার্স সুইং পাওয়া যায়।

যে-কোনো বলের ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে যার ওপর গেলে বল বিপরীত দিকে সুইং করবে। আর গতিবেগ যদি সেই নির্দিষ্ট গতিবেগের কম হয় তাহলে পাওয়া যাবে প্রথাগত সুইং। 1982-র জুন মাসেই এই পরীক্ষানির্ভর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন ইমপিরিয়াল কলেজের গবেষকরা।

কিন্তু রিভার্স সুইং-এর কারণ কী?

কোনো বল যখন দুরন্ত গতিবেগে বাতাস কেটে ছুটে যায় তখন স্রেফ গতিবেগের জন্যই লামিনার সীমান্ত-স্তরে 'টারবুলেন্স' বা 'বিক্ষোভ'-এর সৃষ্টি হয়। সাধারণত এই বিক্ষোভ শুরু হয় বলের মাঝামাঝি জায়গায়। কিন্তু বলের গতিবেগ যতই বাড়তে থাকে, বিক্ষোভ শুরুর ঘটনা ততই এগিয়ে আসে বলের সামনের দিকে। কোনো বলের গতিবেগ যদি তেমন বেশি হয়, তাহলে সিমে আঘাত পাওয়ার আগেই সীমান্ত-স্তর টারবুলেন্ট অবস্থায় চলে যায়। এই অবস্থায় বায়ুগতীয় আচরণ একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। তখন বলের সিম একটা 'র‍্যাম্প' বা নততলের মতো কাজ করে। তার ধাক্কায় বায়ুস্তর বলের গা থেকে আরও দূরে সরে যায়। এতে সিমের দিকে সীমান্ত-স্তর আরও পুরু হয়ে যায় এবং বলের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অনেক তাড়াতাড়ি। ফলে এমন এক পার্শ্ববলের সৃষ্টি হয় যা সিমের দিক থেকে মসৃণ দিকে বলকে ঠেলে দেয়।



রিভার্স বা বিপরীত সুইং (ওপর থেকে দেখলে যেমন দেখাবে)

ইমপিরিয়াল কলেজের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট বলে রিভার্স সুইং পেতে হলে বলের গতিবেগ ঘণ্টায় 80 থেকে 90 মাইলের মধ্যে হওয়া দরকার। সেই কারণেই শোয়েব আখতার বা তাঁর মতো দুরন্ত গতিবেগের দু-চারজন মাত্র বোলার এই 'আশ্চর্য' রিভার্স সুইং-এর সুবিধে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ব্যাপারটির সহজ কোনো ব্যাখ্যা পাননি। ফলে নিজের খুশিমতো তাঁরা রিভার্স সুইংকে কাজে লাগাতে পারেননি।

1992 সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রম ও ওয়াকার ইউনিস এই রিভার্স সুইং ব্যবহার করেই ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করেছেন। অথচ তাঁদের বলের গতিবেগ ঘণ্টায় 80-90 মাইল ছিল না—রিভার্স সুইং-এর জন্য যা দরকার। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যখন রিভার্স সুইং নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন পাকিস্তানী বোলাররাও তাঁদের 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' নিয়ে কম ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা এমন এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন যার ফলে অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগে বল করেও রিভার্স সুইং পাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা এই কৌশলের রহস্য ফাঁস করেছেন অতি সম্প্রতি। তাঁরা জানিয়েছেন, বলের একটা দিক অমসৃণ বা খসখসে করে সেই দিকটা সামনে রেখে বল করলে সাধারণ গতিবেগেই রিভার্স সুইং পাওয়া যায়। মসৃণ তলের চেয়ে অমসৃণ তলে সীমান্ত-স্তর বেশি সহজে 'টারবুলেন্ট' বা 'বিক্ষুব্ধ' হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, অনেক কম গতিবেগেই সিমের কাছে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও সিম নততলের মতো কাজ করে সীমান্ত-স্তরকে বলের গা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে কম গতিবেগেই পাওয়া যায় রিভার্স সুইং। গবেষণায় জানা গেছে, বলের অমসৃণ দিকটাকে সামনে রেখে ঘণ্টায় 65 থেকে 75 মাইল গতিবেগে বল ছুড়লে বেশ ভালোরকম রিভার্স সুইং পাওয়া যায়। সুতরাং, কোয়ার্টার সিমযুক্ত বলে যে-কোনো মিডিয়াম ফাস্ট বোলার রিভার্স সুইং বল করে ব্যাটসম্যানকে বেকায়দায় ফেলতে পারেন। আর বোঝাই যাচ্ছে, একই বলে প্রথাগত সুইং ও রিভার্স সুইং পেতে হলে বলের একটা দিক খসখসে এবং আর-একটা দিক খুব মসৃণ হওয়া দরকার। এখন রিভার্স সুইং ক্রিকেট খেলার একটা নিয়মিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

